দেশবন্ধু

জীবনী ও স্মৃতি

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী

শিশির পাবলিশিং হাউস
২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ কর্তৃক কলিকাতা, ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
শিশির পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক উক্ত
ঠিকানায় অবস্থিত শিশির প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত।

মূল্য তিন টাকা

এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র

চিত্ত-কথা [দেশবন্ধু-স্মৃতি]

জীবনের মূল্যবোধ

মানুষের জীবন-স্রোত দুই বিরাট রহস্যের মাঝখানে বিচিত্র-লীলা, কর্ম এবং কলধ্বনি লইয়া অবিরত বহিয়া চলে; তাহার একপ্রান্ত জন্মশিখরে, আর এক প্রান্ত মরণ-সমুদ্রে।

এই জীবন-যাত্রায় মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা সহনাতীত ; এই সংসারে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু এ দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহত্ত্বেরই গৌরব এই দুঃখ। মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্, অশ্রুজলেই এই মনুষ্যত্বের রাজ্যাভিষেক। এই অভিষেক-দিনে বিধাতা নিজে মানুষের মাথায় মৃত্যুর মুকুট পরাইয়া দেন, তাই মানুষ অমরত্বলাভ করে, অমৃত হয়।

বর্তমানে যেখানে বাঙ্গালীর কোথাও স্থান নাই, স্বাধীনতার অগ্রদূত, যুগ-প্রবর্তক, এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, ত্যাগী, অসাধারণ কর্মী, ভারতের পার্লামেন্টের (গণতন্ত্রের) প্রবর্তক, সেই লোকোত্তর চরিত্রের জীবন আলোচনা করিবার খুবই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই মহৎ জীবনের মূল্যবোধও আমাদের নিকট খুবই কমিয়া আসিয়াছে।

দেশবন্ধুর জীবনীর সাথে আমার আগের লেখা "চিত্ত-কথা" সংযোজিত হইল। ঐ বইতে মহাত্মা গান্ধী যে ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

চিত্ত-কথার কথাগুলি চিত্তরঞ্জনের নিজের মুখের কথা, আমার নয়; এইটাই এই পুস্তকখানির বিশেষত্ব। আমি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে থাকিয়া যে অবস্থায় যখন যে কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, তাহাই

অতিশয় সরলতা ও শ্রদ্ধার সহিত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কিছুই গোপন করি নাই, কোন কথাই কথার আগে উল্টা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করি নাই।

সাধুদেবের পথে যাঁহারা অকপট অন্তরে অগ্রসর হইতেছেন, চিত্ত-কথার কোনও না কোনও কথা তাঁহাদের অন্তরের সংশয় দূর করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের আশা।

বিনীত

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

মাননীয় শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়

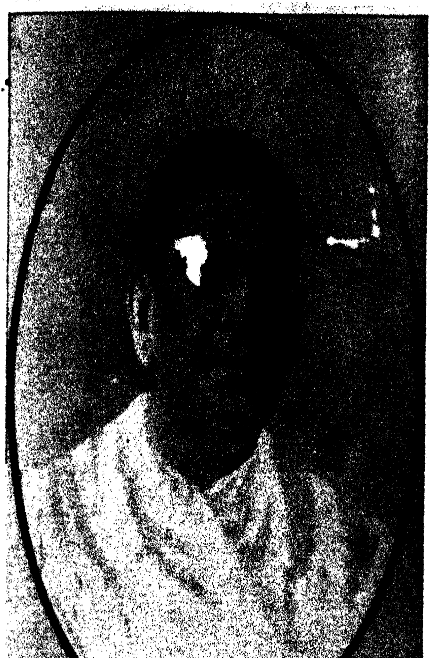
দেশবন্ধু ভারতের প্রথম পার্লামেন্ট গণতন্ত্র সরকারের প্রথম প্রবর্তক, আপনি সেই মহান জীবনের চিন্তা ও কর্মের ধারক ও বাহক হইয়া সুষ্ঠুভাবে বাংলায় গণতন্ত্রের শাসন চালাইতেছেন, সেইজন্যই আপনার হাতে আমার লেখা 'দেশবন্ধু জীবনী ও স্মৃতি' শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিলাম।

শৈলেশ বিশী

দেশবন্ধু সম্বন্ধে এই সকল স্মৃতিকথার কতকগুলি আমি পড়িয়াছি। স্বর্গগত এই দেশপ্রেমিকের স্মৃতিকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে সকল কিছুই আনন্দ ও আগ্রহের বিষয় হইবে।

৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৫
কলিকাতা

এম্‌, কে, গান্ধি



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু জীবনী ও স্মৃতি

ঊনবিংশ শতাব্দী

ঊনবিংশ শতাব্দী সংস্কারের যুগ। বৃটিশ-শাসনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বাদের যতই কুফল থাকুক—একথা অস্বীকার করা যায় না যে বৃটিশ-শাসনের আরম্ভেই বাঙালী ইওরোপের চিন্তার ভাবধারার সহিত বৃটিশ-সাহিত্যের মাধ্যমে সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হইয়াছিল এবং বাঙালী জাতি হেগেল ক্যান্টের দর্শনবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল ও সমগ্র ভারতে অগ্রগতির চেতনা জাগ্রত করিয়াছিল।

ইওরোপের স্বাধীন চিন্তার ভাবধারার বাহক হইয়াছিল—তখনকার দিনে ব্রাহ্ম-সমাজ। বাঙালী জাতি যে সংস্কারের অনুপ্রেরণায় জাগিয়া উঠিয়াছিল—তাহাতেই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠার অন্য কারণও ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারা ও হেগেল-ক্যান্ট দর্শনের

ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী খৃষ্টান হইতেছিল ও প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ ও সুরাপানে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই সন্ধিক্ষণে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা।

ব্রাহ্ম-সমাজ প্রথম হইতেই সর্ব্ববিধ সংস্কারে আগাইয়া আসিলেন। স্ত্রীশিক্ষা, জাতিভেদ দূরীকরণ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁহারা আপোষহীন সংগ্রাম চালাইতে লাগিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা এই সংস্কার-যুগের অন্যতম প্রথম শহীদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ও পেশায় এটর্ণী। তখনকার দিনের এটর্ণীর আয় কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করিতে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। তিনি দুই হাতে টাকা রোজগার করিতেন ও চার হাতে তাহা দান করিতেন।

তাঁহার দান এত বেশী ছিল যে শেষ জীবনে তাঁহাকে এই অপরিমিত দানের জন্য দেউলিয়া হইতে হয়।

দেশবন্ধুর পিতা কেবল 'দাতা' ভুবনমোহন ছিলেন না, তিনি ছিলেন সমাজসংস্কারক ভুবনমোহন ও সাংবাদিক ভুবনমোহন। "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়নের" সম্পাদক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। দেশবন্ধুর মাতা নিস্তারিণী দেবী তাঁহার স্বামীর সুযোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন। নিস্তারিণী দেবী স্বামীর এই দানশীলতায় কোন

দিন তো বাধা দেনই নাই—বরং স্বামীকে উৎসাহিতই করিতেন।

গরীবের দুঃখ দেখিলে—নিস্তারিণী দেবীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত—তিনি চাহিতেন দেশের কোটি কোটি গরীব নর-নারীর কোন দুঃখ না থাকে।

এই দানাঢ্য, সংস্কারক ও সাহিত্য-সেবী পরিবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অষ্টম দশকে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভুবনমোহন দাশের ঠনঠনিয়ার বাড়ীতে চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মগ্রহণ করেন।

এই দাশ-পরিবারের আদি নিবাস—ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার 'তেলির বাগ' গ্রামে।

পিতা-মাতার নিকট হইতে দানশীলতা এবং সংস্কারক ও সাহিত্য-মনোবৃত্তি তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেন, আর লাভ করেন বিক্রমপুরের অতীতের সমস্ত এশিয়া-ব্যাপী শিল্পকুশলতা ও সংস্কৃতিগত অবদানের উত্তরাধিকার।

এই বিক্রমপুর হইতে অতীতে অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, বীরভদ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ "লঙ্ঘি গিরি—দুস্তর পারাবার" তিব্বত, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

শীলভদ্র ছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। হিউয়েন সিয়াং তাঁহার নিকট দশ বৎসর বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দু-

দর্শন অধ্যয়ন করেন। এই বিক্রমপুর হইতে শিল্পীরা তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, জাভা, সুমাত্রায় গিয়া স্থাপত্যের যে অপূর্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা বাঙালী শিল্পীদেরই অবদান। এই শিল্পী-সঙ্ঘের লাঞ্ছন (ট্যাগ) দেখিয়া তাহা ধরা যায়। তাঁহাদের লাঞ্ছন ছিল এক বিশিষ্ট কীর্তিমুখ,—বিশেষ ভঙ্গী সহকারে সিংহের মাথা। এই কীর্তিমুখ আমরা তিব্বত, চীন ও জাভা সুমাত্রার স্থাপত্যে দেখিতে পাই। জাভার বরবুদোর মন্দির ও শ্যামের অরণ্যে পরিত্যক্ত বহু হিন্দু-মন্দিরে এই কীর্তিমুখ ছাপ দেখা যায়। এগুলি বাঙালী শিল্পীর তৈরী। এই কীর্তিমুখ দেখা যায় পরবর্তী কালে গুপ্ত-যুগের স্থাপত্যে।

বালক চিত্তরঞ্জন

পাশ্চাত্য শিক্ষামার্জিত—সমাজ-সংস্কারক পিতামাতা—সাহিত্য-সেবী পিতা ও বিক্রমপুরের আন্তর্জাতিক খ্যাতি—পাণ্ডিত্যে শিল্পে এই সহজাত গুণসমূহের উত্তরাধিকারী হইয়া ও এই বিরাট পটভূমিতে বালক চিত্তরঞ্জন বাড়িতে লাগিলেন।

বাল্যাবস্থায় তাঁহার পাঠে অখণ্ড মনোযোগ ছিল এবং দেহবের সহজাত বাক্তিত্ব লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে কলহ-ঝগড়া—তিনি উভয়

পাকের বক্তৃতা শুনিয়া বিচারিয়া দিতেন। তাঁহার সহপাঠীরা বড় বড়কে তাঁহার রায় মানিয়া লইত। অভিজাত বংশের বালক, অভিজাত পরিবেশেই বাড়িতে লাগিলেন। তবে তাঁহার অভিজাত বলিয়া কোন গর্ব্ব বা অহঙ্কার ছিল না।

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা অপর্ণা দেবী লিখিতেছেন—চিত্তরঞ্জনের মাতা—নিস্তারিণী দেবী বলিতেন, গরমের ছুটীর সময় দুপুরে চিত্তকে ঘরে পাওয়া যাইত না। তখন খোঁজ খোঁজ পড়িয়া যাইত। খোঁজাখুঁজির পর দেখা যাইত—বালক চিত্তরঞ্জন এক কোচড় কাঁচা আম লইয়া—সঙ্গে অবশ্য পেন্সিল কাটা ছুরি থাকিত—অঘোরে আমগাছ-তলায় ঘুমাইতেছেন। তিনি ভবানীপুর মিশনারী স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন।

এই এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য তৈরি হইবার সময় অপর্ণা দেবী, তাঁহার ঠাকুমার মুখে শোনা—বালক চিত্তরঞ্জনের অখণ্ড মনোযোগের কথা বলিতেছেন। * নিস্তারিণী দেবী আসিয়া সকালে বাবাকে একবাটি দুধ খাইতে দিয়া গিয়াছেন। বাবা পড়ায় এমনি মগ্ন যে দুপুরে যখন নিস্তারিণী দেবী আসিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে দুধ খেয়েছিস ?' চিত্ত উত্তর করিলেন—

---

* অপর্ণা দেবী লিখিত "মানুষ চিত্তরঞ্জন"।

'তাইতো, দেখতো মা—বাক্সিতে দুধ আছে কিনা?' মাতা দেখিলেন, বাক্সিতে যেমন দুধ তেমনি আছে। এই আত্ম-ভোলা লোকটি জীবনে নিজের জন্ত কিছু করেননি, বা নিজের জন্ত কিছু রাখিয়াও যাননি।

ইহাই ছিল চিত্তরঞ্জনের মনের আভিজাত্য—যাহা আজকাল দেখা যায় না।

তাঁহার পরের জীবনে যখন আমাদের তাঁহার সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল—আমরা জানি—তিনি কোন দিন আলমারি, দেরাজ বা বাক্সের চাবি নিজে খুলিতেন না।

চাবি খুলিবার দরকার হইলেই মাতা বাসন্তী দেবীর ডাক পড়িত। বাসন্তী দেবী হয় তো ভাঁড়ারে বা অন্ত কোন গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন, তাঁহার আসিতে দেরি হইলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসাও হইত। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্ত।

এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। বাল্যকাল হইতেই চিত্তরঞ্জনের বাগ্মিতা-শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ডিবেটিং ক্লাব পুনর্গঠন করেন ও তথায় রীতিমত বক্তৃতা দিতেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্কটিশচার্চ কলেজে আহুত এক ডিবেটিং সভায় মি, ডাফের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা দুইজন উভয়ের শেষ জীবন

পর্য্যন্ত এই সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়াছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন ও জি, তথা উভয়ে একসঙ্গে আই, সি, এস হইবার জন্য বিলেত যান।

বিলাত-গমন

সেটা বোধ হয় ইং ১৮৯১ সাল। সে সময় শিক্ষিত বাঙালী, বিশেষ করিয়া প্রগতিশীল পরিবারের একমাত্র আদর্শ ছিল তাঁহাদের পুত্রদের আই সি এস করা।

এই প্রগতিশীল ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজ—বিলাতের অনুকরণে খাওয়া পরা—চালচলন নিখুঁত ভাবে অনুকরণ করাই ছিল—ইহাদের আদর্শ। ব্যারিষ্টারেরা সকলেই এই উৎকট প্রগতি-পন্থী নকল সমাজের আওতায় বর্দ্ধিত ও পুষ্ট।

তখন উকীল ব্যারিষ্টারের রোজগারই কি কম ছিল?

ভিক্টোরিয়ার যুগে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ দেখিল, এই বিরাট দেশ—সুদূর ইংলণ্ড হইতে কেবল সৈন্যের সাহায্যে শাসন ও সংরক্ষণ করা অসম্ভব।

অতএব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি করিয়া—মধ্যবিত্ত এক শ্রেণীকে জমি ও জমিদারির মালিক খাড়া করিয়া, চাষী প্রজার নিকট হইতে জমির স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া এই সুবিধাভোগীদের হাতে দিল, ও আদালত সৃষ্টি করায় প্রজা ও জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বিবাদের ফলে

আদালতের যাবতীয় উকীল ব্যারিষ্টার পুষ্ট হইতে লাগিল।

বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ইহাই ছিল অর্থনীতি। ফলে দেশে কোন শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিল না, কৃষির দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল, কৃষক চরম দুর্দশায় পতিত হইল।

শিক্ষিত বাঙালী নিজের ছেলেকে, যার যার ক্ষমতা মত হয় উকীল বা ব্যারিষ্টার করিবে। আর অভিজাতেরা তাঁহাদের পুত্রদের আই, সি, এস করিবেন। তাঁহারা আসিয়া জেলাজজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার হইবেন।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-নীতি এই ভাবে পুষ্ট হইতে লাগিল, দেশের লোকেরাই এই ভাবে শোষণ-নীতি পুষ্ট করিতে লাগিলেন। তবে বৃটিশ এই আই-সি-এস গড়িয়া—এমন শাসক-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিল যে—আজও আই-সি-এস বৃটিশ-সাম্রাজ্যের লৌহ-কাঠামো বলিয়া অভিহিত হয়।

এই পরীক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যাতেই শেষ হইত না—হাতে কলমে—শিক্ষার্থীর শরীর-চর্চা, অশ্বারোহণ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সংগঠন কাজের জন্য তৈরী হইতে হইত ও ঐ ঐ বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইত। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই—আই-সি-এস সিভিলিয়নরা কি কৃষি-বিভাগ, কি শাসন, কি বিচার—

সব বিভাগেই পারদর্শিতার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন।

এ হেন—"বরা-পারে বর্ণ" (Heaven-born) পরীক্ষার জন্য—চিত্তরঞ্জন ও জি গুপ্ত (জান গুপ্ত) বিলাত রওনা হইলেন।

তাঁহার বিলাত-গমনের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতা—১৪৮ নম্বর রসারোডের বাড়ী (বর্ত্তমানে চিত্তরঞ্জন-সেবা-সদন) ক্রয় করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার পিতার আয় কমিয়া গিয়াছে ও তিনি দেউলিয়া হইয়াছেন—তবুও কষ্টে স্বষ্টে পুত্রকে বিলাত পাঠাইলেন।

চিত্তরঞ্জন বিলাত গিয়া আই, সি, এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রথম বার দুই দিন পরীক্ষা দিয়া বুঝিলেন, ঐ দুইদিনের পরীক্ষা তিনি ভাল ভাবে দিতে পারেন নাই, সেজন্য আর বাকী ক'দিন পরীক্ষা দিলেন না। জি গুপ্ত ঐ বৎসরেই পরীক্ষা দিয়া আই, সি, এস হইলেন।

পরের বৎসর চিত্তরঞ্জন ভালভাবে পরীক্ষা দিলেন ও নিজের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় ছিলেন—এমন সময় দাদাভাই নৌরজীর বিলেতের (ইংলণ্ড) পার্লিয়ামেন্টে নির্বাচন লইয়া প্রতিপক্ষ, এমন কি লর্ড সলিসবারী পর্য্যন্ত, দাদাভাই নৌরজীকে "ভারতের ঐ কালা আদমী" বলিয়া জনসভায় তাঁহাকে সম্বোধন করেন। কিন্তু—তরুণ ও

লোকদের সীমা ছাড়াইয়া যায় জন ম্যাকনীল নামে পার্লিয়ামেন্টের জনৈক সদস্য। তিনি ভারতবাসী সম্বন্ধে অতি হীন উক্তি করেন—"ভারত দাসের (Slaves) জাতি—তথায় নীতি-ধর্ম্মের নাম-গন্ধ নাই।"

অগ্নিগর্ভ চিত্তরঞ্জন

—আর যায় কোথায়, যে অগ্নি এতদিন সমিধের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল—এই কটূক্তির ঘর্ষণে তাহা হোমাগ্নির মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন প্রকাণ্ড প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিলেন, ও গ্লাডষ্টোনকে সভাপতি করিয়া তাঁহার জ্বালাময়ী বাগ্মিতায় জন ম্যাকনীলের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহার এই বক্তৃতা সে সময়কার বিলেতের সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং একদিনের মধ্যে জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বাঙ্গালী যুবকের নাম ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বেচারা ম্যাকনীল তাহার উক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কেবল তাহাই নহে, ম্যাকনীলের নাম পার্লিয়ামেন্টের সদস্য পদ হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল।

কর্তৃপক্ষরা যুবক আই, সি, এস-পরীক্ষার্থীর এই দেশাত্মবোধ সুনজরে দেখিলেন না—তাঁহাকে আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা হইল না।

শাপে বর

শাপে বর বলিয়া একটা কথা আছে। যদি চিত্তরঞ্জন আই, সি, এস হইতেন—তাহা হইলে অন্য আই, সি, এসদের মত জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশনার হইতেন।

বিধাতা অলক্ষ্যে হাসিলেন—চিত্তরঞ্জন—আই, সি, এসের বিরুদ্ধে—ব্যারিষ্টারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন—ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন।

চিত্তরঞ্জন ব্যারিষ্টার না হইলে কে অরবিন্দকে অমন ভাবে সমর্থন করিত? ইঁহার ভাগ্যবিধাতা তাঁহাকে এই কাজের জন্য ও অগণিত নিরাশ্রয় জনসাধারণের রক্ষার জন্য তাঁহাকে অসাধারণ বাগ্মিতা ও দরদী প্রাণ ও লোকোত্তর গুণের অধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেজন্য জন ম্যাকলীনকে ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না। ভারতের প্রতি জন ম্যাকলীনের কটূক্তিতে তাঁহার সুপ্ত দেশাত্মবোধ মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইয়াছিল। পরে—তাঁহার সমস্ত জীবনেই আমরা এই দেশাত্ম-বোধের চরম প্রকাশ দেখিতে পাই!

কি রাজনীতি, কি সাহিত্য-সেবা, কি ব্যবহার-জীবনে তাঁহার এই দেশাত্মবোধের জাগ্রত চেতনা—নানাভাবে

বিকশিত হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই সবলে ও সরবে চিত্তরঞ্জনকে "দেশবন্ধু" বলিয়া জনগণ মনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিল।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিলেন। তখনকার দিনে নতুন ব্যারিষ্টারের পশার জমান অতি কঠিন কাজ ছিল। বিশেষ করিয়া দেউলিয়া পিতার পুত্র হিসাবে—অভিজাত মহল তাঁহাকে সুনজরে দেখিত না।

তাহাছাড়া ব্যারিষ্টারি জমাইবার মত বহিরাজ-ঠাট গাড়ি ঘোড়া, চাপরাশী—ইত্যাদির অভাব ত ছিলই। তখনকার দিনে ব্যারিষ্টার বড় কেহ ট্রামে যাইতেন না—তাঁহাদের নিজেদের গাড়ি ছিল। তিনি এই জন্য রসারোডের বাড়ী হইতে হাঁটিয়া ময়দান পার হইয়া হাইকোর্ট যাইতেন ও আসিতেন, পাছে তাঁহার সমব্যবসায়ী ব্যারিষ্টাররা তাঁহাকে তাঁহাদের গাড়িতে উঠিতে (lift) অনুরোধ করেন।

এসময় তাঁহার একমাত্র চিন্তা কি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করা যায় ও পিতার 'দেউলিয়া' নাম ঘোচান যায়। বাড়িতে—আহারের বন্দোবস্ত ছিল মশুরীর ডাল ও আলুভাজা, বিকালে হাইকোর্ট হইতে আসিয়া কিছু খাইতেন

না। তাঁহার নিজের মুখে এসব কথা শুনিয়াছি। এমনি তাঁহার তীব্র আত্ম-সম্মান-বোধ ছিল।

কলিকাতার বাহিরে তাঁহার পসার জমিতে বেশী সময় লাগিল না। অধিকাংশ সময় তিনি ঢাকা রাজসাহী প্রভৃতি জেলার সদর ও মহকুমাতে যাইতেন। ফী অন্য ব্যারিষ্টারের অনুপাতে কম লইতেন।

বিবাহ

এই সময় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে চিত্তরঞ্জনের "সাগর সঙ্গীত" "মালঞ্চ" প্রভৃতি বই প্রকাশিত হইয়াছে।

বিলাত যাওয়ার সময় সমুদ্র দেখিয়া অসীমের পরশ যুবক চিত্তরঞ্জনের কবি-চিত্তে জাগিয়া উঠিল। অসীমের আহ্বান—অপার সমুদ্র দেখিয়া যুবক চিত্তরঞ্জনের চিত্ত সমুদ্রের পানে দোল খাইতে লাগিল। তাহারি বাহিরের প্রকাশ "সাগর সঙ্গীত"। প্রতি পাতায় পাতায়—সকাল হইতে সন্ধ্যা—সমুদ্রের বিভিন্ন রঙের ছবিতে প্রোজ্জ্বল, কী বর্ণ সুষমায় ভরা! সমুদ্রের যে এত রূপ তাহা কে জানিত?

মালঞ্চের কবিতাতে কবি চিত্তরঞ্জন—কবি বলিয়া বাঙলা-সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিলেন।

উপনিষদের ভাষায় "কবি-মনীষী-তত্ত্বদর্শী—এই তিন গুণ চিত্তরঞ্জনের মধ্যে ছিল। তিনি কবি—কেবল ভাবলোলুপতায় নহে—সত্যকার শিল্পী-মন ও সৃজনী-শক্তির প্রভাবে; আর ছিলেন মনীষী ও তত্ত্বদর্শী।

'মালঞ্চে' 'বার-বিলাসিনী' বলিয়া একটা কবিতা ছিল। সেই কবিতায়, কবিগুরুর 'পতিতা'র চাইতেও অনেকাংশে নারীদের প্রতি দরদ, কবির মর্মব্যথা, প্রকাশ পাইয়াছিল।

কবিগুরু লিখিয়াছেন পতিতাদের সম্বন্ধে—

"ধরার নরক সিংহ দুয়ারে—
আমরা জ্বালাই সন্ধ্যাবাতি।"

—আর দরদী চিত্তরঞ্জন বলিলেন—"জগতের যত পাপ তাপ আমরা বুক পেতে নি! ও আমরা পতিতকে উদ্ধার করি।"

আর যায় কোথা? ব্রাহ্মসমাজের খাতা হইতে চিত্তরঞ্জনের নাম কাটিয়া দেওয়া হইল। আর চিত্তরঞ্জনের নামে অপবাদ রটিল—"নাস্তিক ও মাতাল"। অপর্ণা দেবী—তাঁহার "মানুষ দেশবন্ধুতে" লিখিয়াছেন—মা (বাসন্তী দেবী) বলতেন, তোদের বাবার সঙ্গে যখন বিয়ে ঠিক হলো, তখন সত্যি আমার খুব ভয় হয়েছিল,

ভেবেছিলাম কি জানি এই "নাস্তিক" "বাঙালের" হাতে পড়ে আমার কী দুর্দশাই না হয়।"

তার উত্তরে বাবা দেশবন্ধু বলতেন—তোমার আই, সি, এস-এর সহিত বিয়ে হলে 'ডিয়ার'—'ডারলিং' শুনতে শুনতে তোমার কান ঝালা পালা হয়ে যেতো।

এক আই, সি, এস ব্যানার্জীর সাথে বাসন্তী দেবীর আগে বিয়ের কথা হয়। তিনি থাকিতেন সুদূর হায়দ্রাবাদে। বাসন্তী দেবীর পিতা বরদাবাবু কন্যাকে অতদূরে ছেড়ে থাকতে রাজী হন নি।

পুরুলিয়া

এই সময় তাঁহার পিতা পুরুলিয়াতে বাড়ি ক্রয় করেন। বাসন্তী দেবীর তখন অসুখ, কলিকাতায় থাকিয়া কিছুতেই ভাল হইতেছিলেন না। ডাঃ নীলরতন সরকারের পরামর্শে সমস্ত বাপ-পরিবার—কিছু দিনের জন্য পুরুলিয়াতে বাস করেন।

অপর্ণা দেবী লিখিয়াছেন—"সে কী বাড়ী! বিস্তীর্ণ জমির উপর পুকুর-সমেত বাড়ী। ভুবনমোহন বাবুর শিল্পী-মন ছিল, সেখানে যতরকম দুর্লভ ফুল ও ফলের গাছ পাওয়া যায়—সে সমস্ত দিয়া বাড়ী সাজাইয়াছিলেন—এমন কি মিশর হইতে পান্থপাদপ—মরুভূমির গাছ—গাছের গায়ে আঘাত দিলে জল বাহির হয়—আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন।

অপর্ণা দেবী ঐ বাড়ীর নিত্য ভোজন-শালার বর্ণনা দিয়েছেন, "সকাল থেকেই কর্মচাঞ্চল্য সেখানে—প্রশস্ত দালানের একদিকে বড় বাজার উজাড় করে ফেলেছে, সামনেই আম-বাগানের নীচে মাছ কাটা হচ্ছে। ২।৩টী বঁটিতে মা' (বাসন্তী দেবী) পিসীমারা তরকারী কুটছেন। তার মধ্যেই ঠাকুমা (চিত্তরঞ্জনের মাতা) ঘন পুরু সর চিনি দিয়ে—মার মুখে (বাসন্তী দেবী) পুরে দিচ্ছেন। মা—সেই সব ওষুধ গেলার মত করে খাচ্ছেন, আর আমাদের দেখে লোভ হচ্ছে।"

কী অনাবিল আনন্দের মধ্যে এই দাশ-পরিবারের জীবন কাটিত।

তার পরে অপর্ণা দেবী বলিতেছেন—তরকারির বাগানে লাউ কুমড়ার মাচা হতে বেগুন-ক্ষেত লঙ্কা-ক্ষেত, কপির বাগান ঐ বাড়ীতে ছিল, আর সামনের দিকে ফুলের বাগান—বিশেষ করে গোলাপের ক্ষেত। স্বামী-স্ত্রীর (চিত্তরঞ্জনের পিতামাতার) মধ্যে এই চুক্তি ছিল সকালে দু'জনে এক সঙ্গে বাগান হতে ফুল তরকারি সব গাছ থেকে তুলবেন, একা কেহ গাছের ফুল ফল পাড়তে পারবেন না।

বেগুন-ক্ষেতে কাশীর পাঁচ-সেরা বেগুন ফলেছে। নিস্তারিণী দেবী স্বামীকে না জানিয়ে সেই বেগুন একটা তুলেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে বিবেকরণের জন্ত

ঝগড়া। তারপর মিটমাট—আসুক চিত্ত, তাকে জানাই। চিত্ত ছিল পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি মেটাবার আপীল আদালত। চিত্তরঞ্জন কলিকাতাতে থাকিতেন, ছুটিতে, বা কাজ না থাকিলে শনিবারে পুরুলিয়াতে আসিতেন। চিত্তরঞ্জন আসিলে তাঁর পিতা তাঁর মাতার বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিলেন।

চিত্তরঞ্জন তাঁর মাকে বলিলেন, 'মা, সে বেগুন কোথা? অনেক দিন তোমার হাতে লুচি বেগুন-ভাজা খাই নি, এখুনি বেগুন-ভাজা লুচি করে দেও!' অপর্ণা দেবী লিখিয়াছেন—ঠাকুমার রাগ তখনি জল হয়ে গেল। তিনি মহা উৎসাহে ছেলের জন্ত লুচি বেগুন-ভাজা করতে লাগলেন।

এই চিত্তরঞ্জন, আদর্শ পুত্র! পিতৃঋণ মাথে লইয়া জগতে কয় জন দেউলিয়া হইয়াছেন—তিনি আদর্শ স্নেহশীল পিতা-পত্নী-স্বামী।

কী অনাবিল প্রীতিতে এই পরিবার দিন কাটাইত!

এই তো গেল—দাশ-পরিবারের নিত্যকার আতিথেয়তার বর্ণনা—তারপর অপর্ণা দেবী লিখিয়াছেন, তাঁদের পুরুলিয়ার বাড়ীতে 'লাইব্রেরীতে, বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবপদাবলী, গল্পের বই—এইতো গেল বাংলা সাহিত্য, তারপরে

ইউরোপের সেই সময়কার বিশিষ্ট লেখকদের লেখা সমস্ত বই ছিল। আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও মোটামুটি বাংলা সাহিত্য, পরে ইউরোপীয় সাহিত্যের বই তাঁর লাইব্রেরী হতে নিয়ে পড়তাম।'

একাধারে—ভোগ—ত্যাগ ও জ্ঞানের চর্চ্চা—কোন পরিবারে এমন ভাবে দেখা যায় না।

বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দী বিপ্লবের যুগ—বাঙলায় তথা ভারতে ও সমস্ত বিশ্বে।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের পর বাঙলায় যে তুমুল আন্দোলন্ দেখা দেয়—তাহার তুলনা পরে আর কোথাও দেখা যায় না, এক অসহযোগ আন্দোলনের সময় ছাড়া। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া বাঙালীর সমস্ত জাতীয় চেতনা দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল—বাঙালী-জাতি বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িল,—যেন দীর্ঘ ঘুমের পর জাতির দেহের সমস্ত অবসাদ ঘুচিয়া গেল।

দৃঢ় সঙ্কল্পে—গানে সাহিত্যে—সাংবাদিকতায় বাঙালীর বহুমুখী প্রতিভা বিকাশ পাইল।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙালী জাতি একতাবদ্ধ হইয়া বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প করিল। এই আন্দোলনের নাম হইল "স্বদেশী" আন্দোলন।

বৃটিশ-শাসকেরা প্রমাদ গণিলেন। বাঙ্গালী জাতির বিদেশী বর্জন প্রতিজ্ঞায় বিলেতের কাপড়ের কল ম্যানচেষ্টার বন্ধ হইবার উপক্রম হইল,—কারণ কাপড়ের ব্যবসা ম্যানচেষ্টারের একচেটিয়া ছিল।

টাউন-হলে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে বিরাট মিটিং-এ বাঙ্গালী জাতি তাহার বিদেশী বর্জন ও স্বদেশজাত দ্রব্য ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করিবে না বলিয়া সমগ্র জগতের সামনে ঘোষণা করিল।

সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল সংগঠনের কাজ—ভারতে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা ও বাংলায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে আগাইয়া আসিয়া অপরূপ সঙ্গীতে ও গানে এই আন্দোলনকে প্রবর্তিত করিলেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে।
তবে একলা চল রে।'

"হিমাদ্রী পাষাণ কেঁদে গলে যায়
একবার মুখ তুলে আজি চাহ রে।"

"অয়ি ভুবন মন মোহিনী জনক জননী জননী!"

অন্য কবিদের মধ্যে রজনীকান্ত সেনের—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।"

আর দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্ম-বোধ গান—

"এমন দেশটি কোথাও তুমি পাবে নাক খুঁজে
সে যে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা
আমার জন্মভূমি,—আমার জন্মভূমি।"

আর বাহির করিলেন ব্রহ্মবান্ধব—তাঁহার "সন্ধ্যা" কাগজ। তিনি চলতি কথিত ভাষায় "সন্ধ্যা" প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সেইজন্য মুদীর দোকান হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত অবাধ গতি হইল। তিনি লোক-সাহিত্যে বিস্তৃত ছড়া যেমন—

"তোর সাপে কাটল মাথায়,
তাগা বাঁধবি কোথায়?"

প্রভৃতি ছড়া দিয়া জনতার মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা তখনকার দিনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল—এক পয়সা দামের কাগজ। এই জন্য ইহার বহুল প্রচার হইয়াছিল।

বাঙালী জাতি এই আন্দোলনের মন্ত্র বলিয়া ঋষি বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" গ্রহণ করিল। পরে সমগ্র ভারত এবং আজ পর্য্যন্ত "বন্দেমাতরম্" ভারতের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গণ্য হইতেছে।

এই সময় বৃটিশ-শাসক বাঙলার লাট ফুলার অডিন্যান্স পাশ করিয়া 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশ্য পথে ও সভা-সমিতিতে, মিছিলে গান করা বন্ধ করিয়া দিলেন।

বাঙালী সে আদেশ অমান্য করিল। গান্ধিজীর বহু পূর্ব্বেই বাংলা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে।

বাঙালী সে আদেশের বিরুদ্ধে গান বাঁধিল—

"ফুলার করলে হুকুম জারি
'বন্দেমাতরম্' বললে শাস্তি হবে ভারি!"

হইলও তাহা। এই সময় বরিশাল প্রাদেশিক কনফারেন্সে সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেব পুলিস-বাহিনী আনিয়া জোর করিয়া সভা বন্ধ করিয়া দেন ও বন্দেমাতরম্ গান বন্ধ করেন।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ লাঠির আঘাতে জর্জ্জরিত হন। বাঙালী বীর শহীদের রক্তে বরিশাল প্রথম ধন্য হইল।

এই আন্দোলনে বাঙালী জাতি উচ্চ নীচ সব ভুলিয়া গিয়াছিল—রাজা, মহারাজা, ব্যারিষ্টার, উকীল, এটর্ণী প্রভৃতি সমাজের সর্ব্বস্তরের লোক যোগ দিয়াছিলেন এই আন্দোলনে।

এই আন্দোলনে বাঙালীই প্রথম প্রকাশ্য সভায় "স্বাধীনতা জনগণের জন্মগত অধিকার" (Peoples Declaration of Right) ঘোষণা করে ১লা নভেম্বর।

আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য চাই টাকা।

একদিনের সভায় লক্ষাধিক টাকা চাঁদা উঠে, ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য দেন লক্ষ টাকা চাঁদা—

আর দেন, যিনি বিপ্লববাদকে চিরদিন অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন—রাজা সুবোধ মল্লিক। তিন লক্ষ টাকা একদিনে চাঁদা উঠে।

এখন গড়িতে হইবে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। National Council of Education গঠন করা হইল।

আশুতোষ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষিগণ হইলেন ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত যাদবপুরে বিস্তীর্ণ জমি দান করিলেন—যাহার উপর আজ যক্ষা-হাসপাতাল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে—সেই National Council of Education-এর ভিত্তির উপর। এই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্য উপযুক্ত অধ্যক্ষ (Principal) দরকার, অথচ তাঁহাকে বেশী পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে কোথা হইতে? সম্বল তো মাত্র তিন লক্ষ। অতএব কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। কত কম মাহিনায়—মাত্র ভাতা লইয়া কে এই মহৎ কাজের ভার লইতে পারেন?

অরবিন্দ লিখিলেন বরোদা হইতে—তিনি মাত্র ৭৫৲ টাকা মাসিক ভাতা লইয়া এ কাজের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। সকলেই জানিতেন অরবিন্দ আই, সি, এস পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন কিন্তু তাঁহার বিপ্লবী মতবাদের জন্য তাঁহাকে আই, সি, এস চাকরি দেওয়া হয় নাই।

এই অরবিন্দ—যিনি এক নাগাড়ে ২১ বৎসর বিলাতে ছিলেন—যিনি ইংরেজ-পরিবারের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিয়াছিলেন যে নিজের নামের পূর্ব্বে ঐ পরিবারের নাম (Acroid) যুক্ত করিয়া "এ্যাক্রয়েড অরবিন্দ" লিখিতেন।

এই সময় অরবিন্দ বরোদায় মাসিক ১৫০৲ টাকা মাহিনায় কাজ করিতেন। জাতির ডাকে নিজের অন্তরের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় এই পবিত্র মহাব্রত তিনি গ্রহণ করিলেন।

সকলে স্তম্ভিত—বিস্মিত হইল। নিয়তি অলক্ষ্যে হাসিল। কারণ অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জনের মিলন চাই।

বিপ্লববাদের জন্ম

অরবিন্দ বিলাত থাকা কালীন আয়রলণ্ডের মুক্তিকামী সংগ্রামী দল সীনফিনের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বাঙ্গালায় আসিয়া তিনি ইংরেজী 'বন্দেমাতরম', পরে 'কর্ম্মযোগীন' কাগজ বাহির করেন। বরোদা থাকিতেই তিনি 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়া ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন ও দেখান যে দেশের সহিত মাতৃমূর্ত্তির এরূপ বিরাট অথচ সজীব কল্পনা কোন জগতের কোন দেশের জাতীয় সঙ্গীতে নাই।

অরবিন্দ ছিলেন ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষায় পণ্ডিত—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি। বরোদা থাকিতেই অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের উর্বশীর অনুবাদ করেন ও জগতের সামনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম রসানুভূতির মাধুর্য্য প্রচার করেন।

অরবিন্দ বাঙলায় আসামাত্র তিনি জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন—কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতি চলিবে না—চাই বৃটিশ-শাসনের অবসান—সে যে ভাবেই হোক—সক্রিয় পন্থায়।

বহ্নিমান বিপ্লব

কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ—১৯০৮ সাল। সে-সময়কার বাঙলার রাজনৈতিক অবস্থা ও পরাধীনতার বন্ধন ঘুচাইবার জন্য—বাঙালী জাতির বিপ্লব-চেষ্টার পরিচয় দিয়ে দেওয়া হইল।

বাঙালীর বিপ্লবী চিন্তাধারা সারা ভারতে, বিশেষ করিয়া মহারাষ্ট্রে লেলিহান অগ্নির ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। ১৯০৮ খৃঃ ১লা মে তারিখে ক্ষুদিরাম বোসকে গ্রেফতার করা হয়। ২রা মে মুরারীপুকুর বাগানবাড়ী ঘেরাও করিয়া বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষণ রায় ও আরো অনেককে গ্রেফতার করা হয়। একই

দিকে হেমচন্দ্র দাস, অরবিন্দ ঘোষ, শৈলেন্দ্রনাথ বোস ও অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যাকেও গ্রেফতার করা হয়।

২রা মে তারিখে মজঃফরপুর হত্যা মামলার অন্যতম আসামী প্রফুল্ল চাকী মোকামা ষ্টেশনে রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার দেহ হইতে তাঁহার মাথা কাটিয়া পুলিশ সনাক্তের জন্য কলিকাতা আনে। পরে ঐ বিচ্ছিন্ন মস্তক কলিকাতার কোন পুলিশ-ব্যারাকে পুঁতিয়া ফেলা হয়—বলিয়া প্রকাশ।

আজিও বিপ্লবী শহীদ প্রফুল্ল চাকীর ছিন্ন মস্তক কোন অজ্ঞাত (লোকে বলে ভবানীপুর পুলিশ ব্যারাক) পুলিশ ব্যারাকে পোঁতা আছে। ৫ই মে তারিখে শ্রীরামপুর হইতে নরেন গোঁসাইকে গ্রেফতার করা হয়। ৬ই মে কুষ্টিয়ায় (বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-পাকিস্তান অন্তর্ভুক্ত) একজন পাদ্রী সাহেবকে গুলি করার অপরাধে পাঁচজন যুবককে গ্রেফতার করা হয়।

১৩ই মে তারিখে গ্রে ষ্ট্রিটে একখানা ট্রাম-গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

২রা আগষ্ট উল্লাসকর দত্ত, নগেন্দ্র গুপ্ত ও ধরণী গুপ্তের ৭ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

১১ই আগষ্ট তারিখে মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

৩১শে আগষ্ট তারিখে আলিপুর জেলে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্র বসু নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন।

২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজদ্রোহের অপরাধে লোকমান্য তিলকের ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

৭ই নভেম্বর ওভারটাউন হলে বাংলার লেঃ গভর্ণর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়।

৯ই নভেম্বর সি, আই ডি, অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জীকে হত্যা করা হয়।

১০ই নভেম্বর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়। ঐ দিনই শ্রদ্ধেয় মতিলাল রায়ের (প্রবর্ত্তক—অরবিন্দকে পণ্ডিচেরী যাইবার আগে চন্দননগরস্থ নিজ-বাড়ীতে আশ্রয় দেন) নেতৃত্বে বিরাট শবযাত্রা হয়। ইহার পর হইতেই রাজদ্রোহ অপরাধে ফাঁসির শহীদদের মৃতদেহ জেলের ভিতরেই দাহ করার ব্যবস্থা হয়—(সত্যেন বোস, ভকত সিং প্রভৃতি)।

২৩শে নভেম্বর তারিখে সত্যেন বোসের ফাঁসি হয়।

১১ই ডিসেম্বর তারিখে সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে তিন আইনে (Regulation III, 1818) গ্রেফতার করা হয়।

বৃটিশের এই তিন আইনটির স্বরূপ ছিল—যাহাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণের কোন প্রমাণ বা সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যাইত না—তাহাদের কেবলমাত্র সন্দেহের বশে গ্রেফতার করিয়া আটক রাখা হইত।

স্বাধীন ভারতেও এই তিন আইন বলবৎ আছে।

১৩ই ডিসেম্বর তারিখে বরিশালের জনপ্রিয় নেতা অশ্বিনী দত্তকে ও কলিকাতা হইতে রাজা সুবোধ মল্লিককে গ্রেফতার করা হয়।

১৯০৭ সালের পর হইতেই বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলন সুদূর পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে এবং বাঙলার হাতে হাত মিলাইয়া পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র ভারতের এই বিপ্লবী আন্দোলনকে সার্থক করিবার চেষ্টা করেন।

পাঞ্জাবে লালা লাজপত রায়—মহারাষ্ট্রে বীর সভারকর ও লোকমান্য তিলক আগাইয়া আসেন—বাঙলার পাশে।

১৯০৭ খৃঃ ৯ই মে তারিখে লালা লাজপত রায়কে বিনা বিচারে আটক করিবার পর হইতেই সমগ্র পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। ১লা নভেম্বর তারিখে 'সিডিসন এ্যাক্ট্' পাস হইবার পর হইতেই দেশের শিক্ষিত লোকেরা বৃটিশ-শাসনের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন।

এই সময় অরবিন্দের ঐতিহাসিক বোমার মামলা সমর্থনের জন্য চিত্তরঞ্জনের ডাক পড়ে। তিনি তখন সাহিত্য-সেবায় মশগুল হইয়া আছেন। ব্যারিষ্টারীতে তাঁহার প্রচুর পসার হইয়াছে—পিতৃ-ঋণ শোধ দেওয়ার দেশময় তখন ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গিয়াছে।

"পিতৃ-সত্য পালিবার তরে শ্রীরামচন্দ্র যান বনে।"

আর দেউলিয়া পিতার সমস্ত ঋণ কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া—ব্রাহ্মসমাজে 'নাস্তিক ও মাতাল নামে খ্যাত' চিত্তরঞ্জন—ইহার মধ্যে সাগর-সঙ্গীত ও মালঞ্চ প্রকাশিত হইবার পর—"মালা" "অন্তর্যামী" "কিশোর কিশোরী" প্রভৃতি কবিতার বই প্রকাশ করিয়াছেন ও "নারায়ণ" কাগজ বাহির করিয়া উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত সাহিত্য-সেবা ও ব্যারিষ্টারী করেন।

তাঁহার ১৪৮নং রসা রোডের বাড়ী তখন—লেখক, শিল্পী, জ্ঞানী, গুণী, রাজনৈতিক প্রভৃতির অবাধ আড্ডা-স্থল।

অরবিন্দ যখন আলিপুর-জেলে বন্দী থাকিয়া নারায়ণ দর্শন করিতেছেন—চিত্তরঞ্জন তাঁহার বাঁশি শুনিতেছেন—"কিশোর কিশোরী" তাহারি "অন্তর্যামী" ও অন্তরের রসানুভূতির—বহিঃ প্রকাশ।

এই নারায়ণ-সম্পাদনায় গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী ছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হাত—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙলার ও বাঙালী জীবনের ক্রমবিকাশের ধারা—গিরিজাবাবু তাঁহার "রামমোহন" "বিবেকানন্দ" "অরবিন্দ" প্রভৃতি বইয়ে দেখাইয়াছেন। বাংলা-ভাষায় তাঁহার মত গদ্য-লেখক বিরল।

এই "নারায়ণ" কাগজে লিখিবার জন্য শরৎচন্দ্রের

ডাক পড়ে। শরৎচন্দ্র কেবল বর্ম্মা হইতে আসিয়াছেন—সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জন একখানা খালি (Blank cheque) তাঁহার সামনে রাখিয়া বলিলেন—আপনার লেখার পারিশ্রমিক যে কোন অঙ্ক লিখুন।

শরৎচন্দ্র অঙ্কে ১০০০ একহাজার টাকা লিখিলেন। তাহা দেখিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন—মাত্র হাজার।

তাঁহার অভিজাত চিত্ত—এমনি করিয়াই লেখকের মর্য্যাদা দিতেন—ছোট বড় সকলকে।

যখন রসঘন কৃষ্ণের আস্বাদন লোকে পায়—তখন রসানুভূতির ইচ্ছা এত তীব্র হয় যে—নিত্য সেই নাম না শুনিলে মানুষ পাগলের মত হইয়া যায়।

চিত্তরঞ্জন সেইজন্য নিজবাড়ীতে "ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ" করিয়া নিজ কন্যা অপর্ণা দেবীকে কীর্ত্তন-শিক্ষার জন্য বিখ্যাত খোল-বাদক ও পরম বৈষ্ণব ব্রজবাসী বাবুজীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই নাটোর-রাজপরিবারের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের সহিত তাঁহার বিশিষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয় ও সেটা পারিবারিক প্রীতির মধ্যে পরিণতি লাভ করে। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব শেষজীবন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

মহারাজা জগদীন্দ্র ছিলেন—রসগ্রাহী কবি ও সুলেখক—রসশিল্পী ও [illegible]।

এই তিনের (অরবি—রবীন্দ্র—চিত্ত—জগদীশ) সম্মিলনে যে ভাব ও রসচর্চা হইত—তাহার বহিঃপ্রকাশ "নারায়ণ" ও "ব্রজমাধুরী সঙ্ঘ।"

অপর্ণা দেবী লিখিয়াছেন, "বাবা ইদানীং রাত্রে মহারাজা ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে প্রেতাত্মা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য "চক্রে" বসিতেন।

একদিন—সেদিন মহারাজা জগদীশচন্দ্রও ছিলেন—স্বর্গতঃ ব্রহ্মবান্ধবের আত্মাকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া স্পষ্টাক্ষরে পেন্সিলে কাগজের উপর লিখিলেন—"You must defend Arabinda"—তুমি অরবিন্দকে সমর্থন করিবে।

আলীপুর বোমার মামলা

অরবিন্দের মামলায় প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার ফী দিতে দিতে মামলা করিবের ফাণ্ডের টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন ঐ মামলার পরিচালকেরা আসিয়া চিত্তরঞ্জনকে ধরেন। তিনি নামমাত্র ফী-তে এই মামলা লইতে রাজী হন। তখন চিত্তরঞ্জনের ব্যবসায় প্রসার বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মামলা—যাহার পরিণতি হয়ত আসামীদের ফাঁসি—তিনি অক্লেশে বিনায় বাহে

একরকম বিনা পয়সায় লইলেন। এই মামলা পরিচালনা করিতে তাঁহাকে দিনরাত খাটিতে হইত। মামলার কাগজপত্র একত্র করিলে দুই ঘর জুড়িয়া যাইত।

তিনি নিজে দিনরাত পরিশ্রম করিয়া সমস্ত কাগজ ও ব্রীফ পাঠ করেন এবং অন্য কোন মামলা তিনি আর লন না।

এই মামলা পরিচালনা করিবার সময় তিনি আবার অর্থাভাবে পতিত হন এবং সেজন্য নিজের গাড়ী ঘোড়া পর্য্যন্ত বিক্রি করেন।

দীর্ঘ ছয়মাস এই মামলা চলিয়াছিল। অবশেষে চিত্তরঞ্জনের সূক্ষ্ম আইনের যুক্তি-তর্কে অরবিন্দ খালাস পান। তিনি বিচারক বিচক্রফটের সামনে আসামী অরবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"আজ যে অপরাধে ইনি অভিযুক্ত, মনে করবেন না এই বিচারালয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তার মীমাংসা হ'য়ে যাবে। অরবিন্দ আজ মানব ইতিহাসের বিচার-আদালতে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ আমি শুধু এই কথাটাই এখানে বলতে চাই যে আজকের এই বাদানুবাদ যেদিন অতীতের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে, ভবিষ্যতের সেই অনাগত দিনে—আমি জোর দিয়ে বলছি,—আজ যিনি আপনাদের সামনে আসামীরূপে দাঁড়িয়ে আছেন, সেদিন তিনি আর অপরাধীরূপে [illegible] আর [illegible] হবেন [illegible]

চারণ-কবিরূপে দেশের লোকেরা—পৃথিবীর লোকেরা সেদিন এঁকে সম্মান ক'রবে। সেদিনের খুব বেশী দেরী নেই, সেদিন এর বাণী ভারতের সমুদ্রতট ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে সারা বিশ্বের প্রাণে।"

অরবিন্দ এই মামলায় খালাস হন—কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সহকর্মীদের, তাঁহার ভাই বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। হাইকোর্টে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। আপীলে বারীন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির প্রাণদণ্ড মকুব হইয়া চিরজীবন নির্বাসন দণ্ড হয়।

এই মামলার রায় বাহির হইবার পর চিত্তরঞ্জন বলিলেন, উপর হইতে ঘাড় ধরিয়া কে যেন আমাকে এইভাবে খাটাইতেছেন এবং আমি আমার সজ্ঞান অবস্থায়—কি বলিয়াছি—না বলিয়াছি—কিছু আমার মনেতে নাই। কাগজে যখন জজের সুদীর্ঘ রায়ের সহিত তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ বাহির হইল, তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন—আমি এইসব কথা বলিয়াছি—নাকি?

অরবিন্দের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল এবং তিনি ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার রূপে গণ্য হইলেন। হাইকোর্টে বড় বড় মামলার বাদী প্রতিবাদীরা তাঁহার দুয়ারে

ধন্না দিতে লাগিল। তিনি দু'হাতে টাকা রোজগার করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার দৈনিক আয় দু'হাজার টাকার উপর ছিল।

এর পরেই তাঁহার হাতে বিখ্যাত ডুমরাওনের ষ্টেটের মামলা আসিল। এই মামলায় তিনি বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পরে যখন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন—পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রীফ (ডুমরাও মামলা সমেত) ত্যাগ করিয়া অসহযোগে যোগ দিলেন।

১৯০৭ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

অরবিন্দের সক্রিয় নীতি ও কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন দ্বন্দ্ব চরমে উঠিল সুরাট কংগ্রেসে।

সুরাট কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন রাসবিহারী ঘোষ আর বিরুদ্ধ নেতাদের মধ্যে ছিলেন—অরবিন্দের দল। ইহারা লোকমান্য তিলককে খাড়া করিয়া কংগ্রেস অধিবেশনের বৈধতার প্রশ্ন তোলেন—তাহাতে অরবিন্দ-প্রমুখ বিরুদ্ধ-দলের সহিত সুরেন্দ্রনাথ-দলের এক রকম হাতাহাতি হইয়া ঐ কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায় ও বিরুদ্ধ-দল—

অরবিন্দকে সভাপতি করিয়া 'ন্যাশনাল কনভেনসনের সভা' আহ্বান করেন—সুরাটেই।

এই সময় হইতে কংগ্রেস দুই দলে ভাগ হইয়া যায়—সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ দলের নাম হয়—নরমপন্থী ও বৃটিশ-শাসনতন্ত্রের অবসানকারী দলের নাম হয় চরমপন্থী—যথাক্রমে মডারেট ও এক্সট্রিমিষ্ট। কংগ্রেসের মধ্যে এই দুই দলের দলাদলি বাড়িতেই থাকে, কোন আপোষ রফা হয় না। সুযোগ বুঝিয়া সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শাসক-সম্প্রদায় কুকুরের মুখে মাংস টুকরার মত 'মন্‌টেগু-চেমসফোর্ড' নামে এক শাসন-সংস্কারের টুকরো খাড়া করিলেন। তাহাতে সংস্কারের (Reforms) নামে দেওয়া হইল—বড়লাট (ভাইসরয়) ও গভর্নরদের শাসিত দেশে ক'জন মন্ত্রী, বেশীর ভাগ গভর্নমেণ্টের মনোনীত সদস্য, আর কয়েকটি—সুবিধাভোগী সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠান, যেমন জমিদার, চেম্বার অব কমার্স হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই তথাকথিত রিফর্ম বাহির হওয়ার পরেই সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মডারেট দল 'যো হুকুম মহারাজ' বলিয়া সেলাম ঠুকিয়া তাহা মানিয়া লইলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ হইলেন বড়লাট কাউনসিলের মেম্বার। এই পদ গ্রহণ করাতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রীয় জীবনের কবর হইল। কয়েকজন সুবিধাবাদী বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মন্ত্রীগিরি পাইলেন।

এই সময়ের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ফরিদপুর ও ঢাকায় লিটারারী কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করিলেন ও মন্টেগু-রিফর্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ, রিফর্ম নহে। এদিকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিভিয়া যায় নাই, বরং ভূগর্ভস্থ (underground) হইয়া—নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল—ইওরোপ, আমেরিকা ও জাপানে। বিদেশ হইতে অস্ত্র আমদানি করিয়া ভারত আন্তর্জাতিক সাহায্যে আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

খৃঃ ১৯১৪-১৮ প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ হয়। খৃঃ ১৯০৭/৮ সালের পর বহু বিপ্লবী পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হইতে জার্মান ফ্রান্সে গিয়া ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। ওদিকে জাপানে রাসবিহারী বসু ভারতের স্বাধীনতার জন্য 'ইণ্ডিয়া লীগ' স্থাপন করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে ভারত-কাবুল মিশন প্রেরিত হয়—জার্মানী হইতে কাবুলের পথে ভারত আক্রমণ সম্ভব কিনা তাহা দেখিতে। জার্মানী ও ইওরোপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীগণ এই সুযোগ ছাড়িলেন না। তাঁহারা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের নেতৃত্বে একত্র হইলেন। সুইজারল্যাণ্ড হইতে লালা, ম্যাডাম লামা ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতি প্রাক্তন ভারতীয় সমস্ত বিপ্লবী-গণও ইহা অনুমোদন করিলেন।

সেইজন্য বাংলা হইতে ভূপতি মজুমদার (অধুনা বাংলার অন্যতম মন্ত্রী, ইহার পূর্ব্বেও তিনি দামোদর ক্যানেল কর্পোরেশনের মন্ত্রী ছিলেন), নরেন ভট্টাচার্য্য, পরে তিনি মানবেন্দ্র রায় নামে খ্যাত, ভূপেন্দ্র দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই) প্রভৃতি বিদেশে চলিয়া যান। ভূপেন বাবু ছিলেন আমেরিকায়। ভূপতি বাবু (মজুমদার) একেবারে সিঙ্গাপুরে বন্দরক্ষেত্রে দৈনিক এক ডলার (তখন ২৲ টাকা) মজুরী লইয়া দিন-মজুর খাটিতেছেন। আর এ'দিক হইতে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ গঙ্গার মোহনায় আসিলে তাহা আনিবার জন্য দিনের পর দিন নরেন্দ্র চৌধুরী, বাবা গুরু দত্ত সিং প্রভৃতি বিপ্লবীরা সুন্দরবনের গভীর অরণ্যে বাঘ ও কুমিরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া কাজ করিতে লাগিলেন।

নরেন (মানবেন্দ্রকে) চিত্তরঞ্জন নিজবাড়ীতে প্রায় ১৫ দিন লুক্কায়িত রাখিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তাঁহার সিঙ্গাপুর ও জাপান হইয়া রাশিয়ায় যাইবার কথা।

"কোমাগাতামারু" জাপানী জাহাজ অস্ত্র বোঝাই করিয়া গঙ্গার মোহনায় ঠিক সময় আসে। এদিক হইতে বিপ্লবীরা মাল নামাইবার স্থান নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছিতে দেরি করেন। সেই সময়ের মধ্যে গঙ্গার মোহনা ছাড়া আবাদেই জাহাজ দাঁড়াইয়া থাকিতে

দেখিলে লোকের সন্দেহ হয় ও পুলিশের খোঁজ পাইতে দেরি হয় না। অতঃপর পুলিশ বামাল ধরিয়া বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিলেন। ছোটখাট কিছু মাল, রিভলবার প্রভৃতি, বিপ্লবীদের হাতে পড়িয়াছিল।

প্রথম যুদ্ধে জার্মানীতে কাইজারের পতন, রাশিয়ায় জার সাম্রাজ্যের লোপ দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হয়—বিশেষ করিয়া ইওরোপ। ভারতেও সে আবহাওয়ার ধাক্কা আসিয়া লাগিল। বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ টলমল করিতে লাগিল। সে সময়ে ভারতে এত কম সংখ্যক বৃটিশ-সৈন্য ছিল যে বিপ্লবীরা যদি সময় মত সাম্রাজ্যবাদের উপর আঘাত হানিতে পারিতেন—তবে ১৯১৪-১৮ মধ্যেই ভারত হইতে বৃটিশ-শাসন বিচ্ছিন্ন হইত। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।

লোকমান্য তিলক দীর্ঘ কারাবরণের পর মুক্তি পাইয়াছেন। ১৯১৭ সালে কলিকাতা-কংগ্রেসে লোকমান্য তিলককে সভাপতি করা চিত্তরঞ্জন বা চরমপন্থী-দল স্থির করেন। সুরেন্দ্রনাথ বা মডারেট-দল দেশবন্ধুর-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ফিরোজ শা মেটাকে সভাপতি করিতে মনস্থ করেন।

আগে হইতেই ঠিক হইয়াছিল—লোকমান্য তিলক আসিয়া দেশবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হইল না, এই মহামান্য অতিথির

সম্বর্দ্ধনার ভার বাসন্তী দেবীর উপর দিয়া তিনি তিন দিনের জন্য পুরুলিয়ায় চলিয়া যান। কংগ্রেসের তিনদিন পরে আসিয়া তিলক মহারাজের সহিত তিনি মিলিত হন।

লোকমান্য তিলক তাঁহার মহারাষ্ট্রের সমস্ত ডেলিগেট লইয়া একসঙ্গে থাকিতেন।

আমরা দেখিয়াছি, রোজ সকালে তিনি চিত্তরঞ্জনের জুড়ি করিয়া হাবড়ার বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তথায় আহ্নিক পূজাকার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া ভোজনান্তে কংগ্রেসে যাইতেন। সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেন—নিরামিষ। বাসন্তী দেবী তাঁহার এই অতিথিদের বাঙ্গালার সব রকম নিরামিষ রান্না, পিষ্টক পায়েস প্রভৃতি নিজহাতে রান্না করিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। মহারাষ্ট্র দেশে প্রথা আছে, রাত্রে খাইবার পর মিটকুমড়ো সেদ্ধ খান। ইহাতে নাকি পেট পরিষ্কার হয়। তিলক মহারাজ ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সকলে এটা নিয়মিত খাইতেন। এটুকু আমাদের মনে আছে।

মণ্টেগু-রিফর্ম লইয়া তর্ক চরমে উঠিল—মডারেটরা ঐ রিফর্ম কংগ্রেস হইতে মানিয়া লইবার জন্য খুব জোড়জোড় করিতে লাগিলেন—আর চরমপন্থীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কংগ্রেস হইতে উভয় দল মিলিয়া কোন কার্যপদ্ধতি ঠিক হইল না।

চরমপন্থীরা দেশবন্ধু ও তিলক মহারাজের নেতৃত্বে মণ্টেগু-রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসে যোগদান করেন ও চিত্তরঞ্জন তাঁহার সহিত মিলিত হন।

১৯১৮ সাল

ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন এমন এক গতি (momentum) লইয়াছে যে তাহাকে কেহ রুখিতে পারিতেছে না।

এই স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ-সঞ্চার করেন চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতারা।

তখন পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মাজী সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই বা সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিও কিছু স্থির করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের পর পাঞ্জাবে বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে শক্তিশালী গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল গদর (Gadhar)। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় আমেরিকায়, পরে পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই গদর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার জন্য

সম্বর্দ্ধনার ভার বাসন্তী দেবীর উপর দিয়া তিনি তিন দিনের জন্য পুরুলিয়ায় চলিয়া যান। কংগ্রেসের তিনদিন পরে আসিয়া তিলক মহারাজের সহিত তিনি মিলিত হন।

লোকমান্য তিলক তাঁহার মহারাষ্ট্রের সমস্ত ডেলিগেট লইয়া একসঙ্গে থাকিতেন।

আমরা দেখিয়াছি, রোজ সকালে তিনি চিত্তরঞ্জনের জুড়ি করিয়া হাবড়ার বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তথায় আহ্নিক পূজাকার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া ভোজনান্তে কংগ্রেসে যাইতেন। সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেন—নিরামিষ। বাসন্তী দেবী তাঁহার এই অতিথিদের বাঙ্গালার সব রকম নিরামিষ রান্না, পিটক পায়েস প্রভৃতি নিজহাতে রান্না করিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। মহারাষ্ট্র দেশে প্রথা আছে, রাত্রে খাইবার পর মিঠকুমড়ো সেদ্ধ খান। ইহাতে নাকি পেট পরিষ্কার হয়। তিলক মহারাজ ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সকলে এটা নিয়মিত খাইতেন। এইটুকু আমাদের মনে আছে।

মণ্টেগু-রিফর্ম লইয়া তর্ক চরমে উঠিল—মডারেটরা ঐ রিফর্ম কংগ্রেস হইতে মানিয়া লইবার জন্য খুব জোড়জোড় করিতে লাগিলেন—আর চরমপন্থীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কংগ্রেস হইতে উভয় দল মিলিয়া কোন কার্যপদ্ধতি স্থির হইল না।

চরমপন্থীরা দেশবন্ধু ও তিলক মহারাজের নেতৃত্বে মন্টেগু-রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসে যোগদান করেন ও চিত্তরঞ্জন তাঁহার সহিত মিলিত হন।

১৯১৮ সাল

ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন এমন এক গতি (momentum) লইয়াছে যে তাহাকে কেহ রুখিতে পারিতেছে না।

এই স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ-সঞ্চার করেন চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতারা।

তখন পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মাজী সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই বা সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিও কিছু স্থির করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের পর পাঞ্জাবে বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে শক্তিশালী গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল গদর (Gadhar)। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় আমেরিকায়, পরে পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই গদর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিবার জন্য

সম্বর্দ্ধনার ভার বাসন্তী দেবীর উপর দিয়া তিনি তিন দিনের জন্য পুরুলিয়ায় চলিয়া যান। কংগ্রেসের তিনদিন পরে আসিয়া তিলক মহারাজের সহিত তিনি মিলিত হন।

লোকমান্য তিলক তাঁহার মহারাষ্ট্রের সমস্ত ডেলিগেট লইয়া একসঙ্গে থাকিতেন।

আমরা দেখিয়াছি, রোজ সকালে তিনি চিত্তরঞ্জনের জুড়ি করিয়া হাবড়ায় বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তথায় আহ্নিক পূজাকার্য্য শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া ভোজনান্তে কংগ্রেসে যাইতেন। সকলে একসঙ্গে বসিয়া খাইতেন—নিরামিশ। বাসন্তী দেবী তাঁহার এই অতিথিদের বাঙ্গালার সব রকম নিরামিশ রান্না, পিঠক পায়েস প্রভৃতি নিজহাতে রান্না করিয়া সকলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। মহারাষ্ট্র দেশে প্রথা আছে, রাত্রে খাইবার পর মিষ্টকুমড়ো সেদ্ধ খান। ইহাতে নাকি পেট পরিষ্কার হয়। তিলক মহারাজ ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য সকলে এটা নিয়মিত খাইতেন। এইটুকু আমাদের মনে আছে।

মণ্টেগু-রিফর্ম লইয়া তর্ক চরমে উঠিল—মডারেটরা ঐ রিফর্ম কংগ্রেস হইতে মানিয়া লইবার জন্য খুব জোড়জোড় করিতে লাগিলেন—আর চরমপন্থীরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কংগ্রেস হইতে উভয় দল মিলিয়া কোন কার্যপদ্ধতি স্থির হইল না।

চরমপন্থীরা দেশবন্ধু ও তিলক মহারাজের [illegible] মন্টেগু-রিফর্ম প্রত্যাখ্যান করিলেন। মহাত্মা গান্ধী এই কংগ্রেসে যোগদান করেন ও চিত্তরঞ্জন তাঁহার সহিত মিলিত হন।

১৯১৮ সাল

ঘটনা-প্রবাহ দ্রুত আগাইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন এমন এক গতি (momentum) লইয়াছে যে তাহাকে কেহ রুখিতে পারিতেছে না।

এই স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রাণ-সঞ্চার করেন চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতারা।

তখন পর্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মাজী সক্রিয় কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই বা সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিও কিছু স্থির করেন নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের পর পাঞ্জাবে বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে শক্তিশালী গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল গদর (Gadhar)। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় আমেরিকায়, পরে পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই গদর বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে দমন করিবার জন্য

বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এই সকল আন্দোলন পিষিয়া মারিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট 'রাউলাট' আইন পাশ করিলেন। ঐ আইন অনুসারে পাঞ্জাবের সর্বত্র প্রকাশ্য সভা বন্ধ হইল, চারিজন লোক একসঙ্গে পথে বাহির হইলে অমনি গ্রেপ্তার হইবে। লাহোর, অমৃতসর প্রভৃতি বড় বড় সহরে ১৪৪ ধারা দ্বারা উক্ত নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

কিন্তু পাঞ্জাবীরা তাহাতেও দমিল না।

জালিওয়ানাবাগ

ইহার পরের ঘটনা অমানুষিক—ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। অমৃতসরে নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সভা বন্ধ করার আদেশ জারি হইল।

জালিওয়ানাবাগে উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া সভা করা হইবে স্থির হইল। প্রথমে স্থির হয় গোপনে। লালা হংসরাজ বলিয়া এক গুপ্তচর সে খবর পুলিশ-কর্তৃপক্ষের কানে দেয়।

জালিওয়ানাবাগ চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা এক পার্ক। মধ্যে জল-সেচের জন্য এক ইন্দারা—প্রবেশের পথ একটি।

ডায়ার বলিয়া এক সৈনিকের উপর আদেশ দেওয়া হয় যে ঐ সভা যেন না হয়—সভা ভাঙিয়া দিতে হইবে।

পার্কে বিকেলের দিকে বহু শিশু ও বৃদ্ধা রমণী হাওয়া খাইতে গিয়াছিল—তাহারা অনেকেই সভার কথা জানেনা—এমন সময় সভা আরম্ভ হয়। ইহার মধ্যে অধিকাংশই কৌতুহলি দর্শক ছিল। পাঁচ হাজারের উপর লোক জমায়েত হইয়াছিল।

ও'ডায়ার আসিয়া পার্কের গেটে সৈন্য মোতায়েন করিয়া বেপরোয়া সাত রাউণ্ড গুলি চালাইল। কত লোক ভীত ত্রস্ত জনতার পায়ে নিষ্পেষিত হইল—আর সংখ্যাতীত লোক গুলি খাইয়া মরিল। অনেকে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ইন্দারায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিল।

মুহূর্তের মধ্যে এক নৃশংস বর্বর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল।

কংগ্রেস এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের এক তদন্ত কমিটি ঘোষণা করে, তাহাতে চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল, জহরলাল ও মহাত্মাজী ছিলেন।

১৯১৯ খৃঃ মাঝামাঝি এই তদন্ত-কমিটিতে যোগ দিবার জন্য চিত্তরঞ্জন অমৃতসরে যান এবং পণ্ডিত মতিলাল, জহরলাল, মহাত্মাজী সকলেই আসেন।

তিনজনেই সপরিবারে অমৃতসরে মিলিত হন। ইহার আগে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় ছিল, কিন্তু ইহাদের পরিজনদের মধ্যে কোন পরিচয় ছিল না।

এই তিন পরিবার মিলিয়া যেন এক হইয়া গেল,

এবং ইহাদের এই পারিবারিক প্রীতিবন্ধন ও মমতা প্রত্যেকের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

অপর্ণা দেবী লিখিতেছেন—

স্বরূপরাণী নেহরু, কমলা নেহরু, মা, বিজয়লক্ষ্মী, আমরা দুই বোন ও কস্তুরী বাইর সঙ্গে আমরা এক পরিবারভুক্ত ছিলাম—রান্না খাওয়া ঘর-সংসারের ভার ছিল আমাদের উপর। আর বাবা, পণ্ডিত মতিলাল, মহাত্মাজী ও জহর—উদয়াস্ত খাটিয়া লোকের জবানবন্দী লিখিতেছেন—কত পুত্রহারা মাতা, স্বামীহারা বিধবা, স্ত্রীহীনা স্বামী, অসংখ্য ভাই-বোন—দিনের পর দিন এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষী দিতেছে—যাহা শুনিলে অতি নিষ্ঠুর লোকেরও চোখের জল সম্বরণ করা দায় হয়।

তাঁহাদের সাক্ষীতে জানা যায় যে বৃটিশ-কর্ত্তৃপক্ষ সাত দিন গাড়ী গাড়ী মাটি ফেলিয়াও বাগের রক্তের দাগ মুছিতে পারে নাই।

ও'ডায়ার সাক্ষীতে বলে—"আমি গুলি না চালিয়েও পারতাম—কিন্তু রোজ রোজ এই ঝামেলা—আজ এখানে মিটিং, কাল ওখানে প্রসেশন, ১৪৪ ধারা অমান্য করা ভাল লাগে না।—তাই আমি একদিনেই সব শেষ করেছি।" —তার নিজের কথা—"I wanted to finish in a day."

—ইহাই বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীর মনোভাব—ও'ডায়ার তাহার বাহিরের নমুনা।

এই অত্যাধুনিক বর্বরতার জোড়া পৃথিবীর কোথাও মেলে না। জারের আমলে মজুর জনতা যখন শোভাযাত্রা করিয়া জারের শীতপ্রাসাদে অভিযান করিয়াছিল, তখন তাহারা একেবারে নিরস্ত্র ছিল না—জারের রক্ষী-দল তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহার পর হইতেই বলশেভিকের জন্ম হয়।

বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীর হিংস্র বর্বরতা, তাহার অস্ত্র-বল ও লোকবলের বিরুদ্ধে কীভাবে সংগ্রাম চালান যায়, জালিওয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে—প্রচণ্ড-মর্ম বেদনায় মহাত্মাজীর অবচেতন মন হইতে বাহির হইল—"অসহযোগ"।………

যেমন, বহরমপুরে কাছারী হইতে ফিরিবার পথে—খেলার মাঠ দিয়া পাড়ী করিয়া আসিতে গোরা-সৈনিকের অভদ্র আচরণে মনে মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র সারারাত কাঁদিয়া ইহার প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পাইলেন তাঁহার ধ্যানে—বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে। দেশমাতৃকার মোহিনী রূপ দেখিয়া—বঙ্কিম সব ব্যথা ভুলিয়া গেলেন।

যেমন ঔপন্যাসিক দরদী শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন-স্টেশনে ধুতি চাদর পরিয়া বেঞ্চে বসিবার জন্য সাহেবের ঘুষি খাইয়াছিলেন—অপমানে সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া—এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের পথ খুঁজিয়া পাইলেন "পথের দাবীতে"—সব্যসাচীর চরিত্র সৃষ্টি করিয়া। তেমনি

মহাত্মাজী জালিওয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে—তাঁহার আত্মিক-শক্তি দিয়া উপলব্ধি করিয়া জাতিকে দিলেন অসহযোগ-মন্ত্র।—জাতির আত্মচেতনা জাগ্রত করিবার জন্য বৃটিশের সহিত আমরা কোন সহযোগ করিব না।

১। আমরা তাহাদের স্কুল-কলেজে পড়িব না।

২। আমরা তাহাদের আইন আদালতে যাইব না।

৩। আমরা গভর্নমেন্টের চাকুরি ছাড়িয়া দিব।

৪। আমরা বৃটিশ-পণ্য ক্রয় করিব না।

৫। আমরা হিংসা করিব না।

অসহযোগ আন্দোলন মোটেই নেতিবাচক নহে। বর্বরতা ও হিংসার বিরুদ্ধে ইহার চাইতে সক্রিয় প্রতিরোধ আর কি হইতে পারে?

আর বলিলেন, উপরের পাঁচ দফা কর্মপদ্ধতিতেই চলিবে না, আমাদের প্রত্যহ কিছু কিছু উৎপাদন করিতে হইবে। সেটা কি? না—চরকা।

তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে অনেকেই হাসিল—বাহিরের অনেকেই তাঁহাকে পাগল উন্মাদ বলিয়া পরিহাস করিল। ঐ লোকটা বলে কি? বৃটিশের কামান-বন্দুকের সামনে 'চরকা'! আর গভর্নমেন্টের চাকুরি ছাড়িয়া দিলে লোকে খাইবে কি? আর আদালতে না গেলে—উকীল-ব্যারিষ্টারেরাই বা চলিবে কি করিয়া, আর ইস্কুল-কলেজ ছাড়িলে, ছেলেরা না

পড়িলে হইবে মূর্খ, জেদো ও রোজগারহীন অলস প্রকৃতি। তাহাদেরই বা খাওয়াইবে কে? মহাত্মাজী হাসিয়া বলিলেন—তারা নিজেরাই নিজেদের ভাত করে নেবে।

কি করে?—সুতো কেটে।

সুতো কেটে ভাত কি করে হয়—সে কথা কেউ বুঝতে চাইল না।

মহাত্মাজী বলিলেন—৩২ কোটী ভারতবাসী যদি রোজ এক গজ করে সুতো উৎপন্ন করে, তাহলে রোজ ৩২ কোটী গজ সুতা হয়। তার অর্দ্ধেক হয় ১৬ কোটী গজ। বাকি অর্দ্ধেক বিক্রি করে যা' পাবে তাই দিয়ে তোমাদের পেটের ভাতের যোগাড় হবে। দেশের নিরন্ন দরিদ্র লোকের মত জীবন যাপন না করলে—তাদের সাথে সমান হবে কি করে? আমাদের অভাব কাপড়ের—সকলে সুতা কাটলে আমাদের কাপড়ের চাহিদা মিটিয়ে—কাপড় বিদেশে রপ্তানি করতে পারি। তাতেও দেশে প্রচুর টাকা হবে। ইহাই আমার পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি, ইহার ভিত্তি—অর্থনৈতিক ও প্রতিরোধ—অহিংস অসহযোগ সংগ্রামী কর্মপদ্ধতি।

সশস্ত্র বিপ্লবের চাইতে ইহা বেশী কার্যকারী হবে এই জন্য যে ১৯০৫ হতে—আজ ১৯১৯ পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর আমরা সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করেছি। অনেক অমূল্য প্রাণহানি হয়েছে—চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে বারেবারে।

অবশ্য এই অহিংস অসহযোগে প্রাণহানি হবে সন্দেহ নেই, তবে বেশী দিন যদি আমরা হিংসা না করি তবে প্রাণহানি বন্ধ হবে। এই কর্মপদ্ধতি বৃটিশের দণ্ড-বিধির (Penal Code) আওতায় আসে না।

সকলে নির্বাক হইয়া শুনিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু বা পণ্ডিত মতিলালের মনে গান্ধিজীর প্রস্তাব কোন রেখাপাত করিল না। উভয়কে চিন্তান্বিত দেখা গেল।

গান্ধিজী হাসিয়া পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে এসেছে মটরকার, দু'জনের প্রায় কুড়িজন খিদমৎকারি বা খানসামা, বাবুর্চি ইত্যাদি—এতো সবই বৃটিশের অনুকরণ। এত উচ্চ জীবনযাত্রার মান আমার তোমার দেশের লোকেদের কোথায়? সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদের সহিত সব রকম সহযোগিতা বর্জন করতে হবে।

স্তব্ধ হইয়া পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধু শুনিতেছেন। স্থির হইল, আগামী অমৃতসর-কংগ্রেসের অধিবেশনে দেশবাসীর সম্মুখে সক্রিয় অহিংস কর্মপদ্ধতি পেশ করিতে হইবে।

এই সময়টাই ছিল অসহযোগ আন্দোলনের উপযোগী—জনগণ ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মনস্তত্ত্ব দিক দিয়া ঠিক উপযুক্ত সময় (Psychological moment.)।

কংগ্রেসের মধ্যে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নাই। এখন

মহাযুদ্ধে রাশিয়ার বিস্ময়কর সাফল্য—জারের রাষ্ট্র ধ্বংস করিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হইল মার্কসবাদের ভিত্তিতে। ইওরোপ হইতে রাজতন্ত্র বিলীন হইল। ভারতে মহাত্মা গান্ধী অভিনব উপায়ে অহিংস অসহযোগ কর্মসূচী দিয়া বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-ধ্বংসের কর্মপদ্ধতি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন রুশ-বিপ্লবের চাইতে কম বিস্ময়কর ঘটনা নয় এবং ইতিহাসের অঙ্গে বিংশ শতাব্দীর এই দুই বিভিন্ন ধারার বিপ্লবী প্রচেষ্টা চিরদিন অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মিসেস এ্যানি বেশান্ত ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিয়া সম্পূর্ণ ভারতীয়ের মত জীবনযাত্রা শুরু করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী—তাহা ছাড়া থিওসফি-ক্যাল প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী।

এই থিওসফিক্যাল প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা জগৎ-ব্যাপী ও ইহার খুব আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি আসিয়াই কাশী—বারাণসীকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। প্রথমে তাহার নাম হয়—কাশী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ। আমার ঐ স্কুল ও কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। তখনকার দিনে (১৯০২-১৯১৭)—ভারতে এত বড় আবাসিক স্কুল ছিল না। সমস্ত ভারতের প্রদেশ হইতে শিক্ষার্থীরা

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র হইতে জাষ্টিস তেলেঙের পুত্র পুরুষোত্তম কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ—(পি কে তেলঙ), তাহার ভাই কে পি তেলঙ কাউটকার—পণ্ডিত শাস্ত্রী, মাদ্রাজ হইতে শিবা রাও, সঞ্জীব রাও ও সর্বোপরি ছিলেন—জর্জ এস এরুণ্ডেল, ক্যামব্রিজের এম-এ হেড-মাষ্টার। অধ্যক্ষ ছিলেন ডক্টর রিচার্ডসন নামে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত।

এই সময় মিসেস বেশান্ত—হোমরুল-লীগ বলিয়া এক স্বায়ত্বশাসন লীগ স্থাপন করেন।

ঐ লীগে পরে লোকমান্য তিলক যোগ দেন। মডারেট-দল হোমরুল-লীগের মারফৎ মণ্টেগু-রিফর্ম পাশ করাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। পরে মিসেস বেশান্ত কংগ্রেসের (কলিকাতা) সভানেত্রী পর্য্যন্ত হন।

যখন হোমরুল-লীগ মণ্টেগু-রিফর্ম পাশ করাইতে চেষ্টা করেন তখন বোম্বাই-কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জনের প্রতিবাদে তাহা পাশ হয় না।

অমৃতসর তদন্ত কমিটির কাজ শেষ হইতে না হইতেই অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে জনতার উদ্দীপনা এত বেশী ছিল যে জনতাকে জালিওয়ানাবাগের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উষ্মা ও আবেগ হইতে শান্ত করিতে মহাত্মাজী ও চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতাগণের বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

মোটামুটিভাবে অসহযোগের পরিকল্পনা এই কংগ্রেসে আলোচিত হয়, তবে কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয় না। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের দুইটি অধিবেশন হয়—বোম্বে ও কলিকাতায়।

বোম্বে-কংগ্রেসে মডারেট-দল—কংগ্রেসে কোন পাত্তা পান না। তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

কলিকাতা-কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হয় ও দেশবাসী মহাত্মাজীর পাঁচ দফা কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

এই সময় নেতাজী সুভাষ দেশবন্ধুর সহিত যোগ দেন। তিনি দেশবাসীর সংগ্রামী কর্ম-পদ্ধতির কথা বিলাতেই শুনিয়াছিলেন। তিনি অসহযোগের ডাক শুনিয়া আই-সি-এস চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া, দেশের ডাকে ছুটিলেন দেশে।

প্রথমে ভারতে আসিয়াই তিনি মহাত্মাজীর সাথে দেখা করেন ও তাঁহাকে তাঁহার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আপোষহীন সংগ্রাম চালাইবার ব্যবস্থা কি না জিজ্ঞাসা করেন।

নেতাজী তাঁহার Indian Struggleএ লিখিয়াছেন, মহাত্মাজী বলেন, আমার সুনির্দিষ্ট পন্থা—একমাত্র অহিংসা। আমরা মনে প্রাণে ও কাজে অহিংস হইয়া এ সংগ্রাম

চালাইলে—বৃটিশ-শাসনযন্ত্র আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বৃটিশ-জাতি বা কোন ইংরেজের উপর আমরা কোন হিংসাভাব পোষণ করিব না—ইহাই আমার অহিংসা সংগ্রামের মূল নীতি। ইহার এক নাম সত্যাগ্রহ। এই অহিংসা-সংগ্রামের ধর্ম্ম নৈতিকগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর ইহার অর্থনৈতিক ভিত্তি—চরকা।

নেতাজী লিখিয়াছেন, আমার প্রশ্নের উত্তরে অসহযোগের প্রথমকার কথা—পাঁচ দফা কর্ম্মসূচী হয়তো মানিতে পারা যায়, কিন্তু অর্থনৈতিক প্রশ্নের উত্তরে চরকার কথা মানিতে আমি প্রস্তুত নই। তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—যদি ইহাতে বৃটিশ-শাসনতন্ত্রের অবসান না হয় —তাহা হইলে কি করিবেন? মহাত্মাজী বলিলেন, সেটা আমি ভাবিনাই। আগে ইহার প্রয়োগে কি হয় দেখি, পরে যখন যেমন সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

মহাত্মাজীর এই জবাবে আমার মন সায় দিল না। এত বড় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব বুঝিলাম—মহাত্মাজী এখনও সেটা ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

বোম্বে হইতে সুভাষবাবু কলিকাতা আসিয়া দেশবন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলেন। দেখামাত্র উভয়ের প্রতি উভয়ে আকৃষ্ট হইলেন।

সুভাষবাবু লিখিয়াছেন—একদিন পরে আমি আমার

মনের মত নেতা পাইলাম—যিনি আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন।

অসহযোগী দেশবন্ধু

দেশবন্ধু মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন।

এতদিন তাঁহার মনের মাঝে যে আগুন ছিল—আজ সত্যই তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল।

তিনি ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিলেন। সে সময় তাঁহার হাতে ডুমরাও কেস এবং অন্যান্য কেস লইয়া নগদ প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ব্রীফ। তিনি পেছনে না চাহিয়া একেবারে সব ছাড়িয়া দিলেন।

আত্মীয় বন্ধু, নিজ পরিজন বুঝাইলেন, এখন চলিবে কি করিয়া?

তিনি হাসিয়া বলিতেন—যিনি চালাবার তিনিই চালাবেন।

তিনি বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন এবং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে প্রাণ-সঞ্চার করিলেন। সমস্ত জেলা-কংগ্রেস-কমিটিগুলি নূতন করিয়া পুনর্গঠিত হইল এবং অসহযোগের পাঁচ দফা কর্মসূচী সর্বত্র যাহাতে পালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

অনেকে সরকারী চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন। ছাত্রের

দল স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া দিল। মদের দোকানে পিকেটিং করিয়া যাহাতে মদ বিক্রয় না হয় সেই চেষ্টা চলিতে লাগিল। খদ্দর-ফেরী, সুতা-কাটা, চরকার ব্যাপক প্রচার আরম্ভ হইল।

সে সময়ের আন্দোলন যে কী ব্যাপার, যাহারা তাহা না দেখিয়াছেন তাহাদের বুঝান অসম্ভব। প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক টহল দিয়া ফিরিত, আর পুলিশ আসিয়া তাহাদের গ্রেফতার করিয়া লইয়া যাইত।

কলিকাতার বুকের উপর তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যাইত। একদল গ্রেফতার হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একদল আসিতেছে—তারপর আর একদল—তারপর আরও।

প্রেসিডেন্সী জেল ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল দেখিতে দেখিতে ভর্ত্তি হইয়া গেল। জেলে আর জায়গা নাই। তারপর ময়দানে আর এক জেল খোলা হইল—নাম হইল ক্যাম্প জেল। সেটাও ভর্ত্তি হইয়া গেল। তারপর ময়দানে আর এক জেল খোলা হইল—সেটাও ভর্ত্তি হইয়া গেল। তখন বৃটিশ-শাসনতন্ত্র সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের আর জেলে পুরিত না, লরী বোঝাই করিয়া কলিকাতার বাহিরে ও বনে জঙ্গলে মারপিট করিয়া ছাড়িয়া দিত।

ছাড়া পাওয়া মাত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা পরদিন আবার সত্যাগ্রহ করিত।

বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং রীতিমত ভয় পাইয়া গেল, কারণ এতদিনকার—প্রায় দেড়শ বছরের ভারত-শাসনে এমন অদ্ভুত ব্যাপার তাহারা দেখে নাই বা শোনে নাই—নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত ব্যক্তি আঘাত করে না।

বাসন্তী দেবী ও ঊর্মিলা দেবী খদ্দর ফেরী করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার হইলেন। ইহাতে আন্দোলনে আরও প্রাণ-সঞ্চার হইল। তাঁহাদের এক রাত্রি হাজতে রাখিয়া পরদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে হাজির করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের ছাড়িয়া দেন।

দেশবন্ধু 'ফরওয়ার্ড' কাগজ বাহির করিয়া সুভাষবাবুর উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুভাষবাবুর কাজে নিষ্ঠা তাঁহার সহকারীদের মাতাইয়া দিয়াছিল। সকাল হইতে দুপুর-রাত পর্য্যন্ত তিনি কাগজ সম্পাদনা, তাহার প্রচার লইয়া অফিসে থাকিতেন—খাইতেন—চা, মুড়ি প্রভৃতি নিতান্ত সাধারণ খাদ্য।

এই ১৯২১ সালে যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডকে ভারতে আনিয়া বৃটিশ আমলাতন্ত্র একটা উৎসব হৈ চৈ করিয়া এই আন্দোলন চাপা দিবে স্থির করে। এই সময় ভারতের বড়লাট লর্ড রিডিং। যেদিন বাসন্তীদেবী ও

ঊর্মিলা দেবী গ্রেপ্তার হন ঐদিন সন্ধ্যায় ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে (আজ সেখানে কেন্দ্রীয় টেলিফোন বিল্ডিং) লর্ড রিডিং-এর সম্বর্ধনায় বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে।

বাসন্তীদেবীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়াই অনেক অতিথি ভোজসভা ত্যাগ করেন।

এই ঘটনার পরে লর্ড রোনাল্ডসে, বাংলার গভর্নর, লাটপ্রাসাদে চিত্তরঞ্জনকে সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

লোকে ভাবিল, হয়ত আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে গভর্নমেন্ট এইবার নতি স্বীকার করিবে।

এই সাক্ষাতের কিছুদিন পরে দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হন— যুবরাজের ভারত-ভ্রমণের ঠিক আগে। গভর্নমেন্ট হয়তো মনে করিয়াছিল, চিত্তরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করিলে উত্তেজনা থামিয়া যাইবে, কিন্তু ফল হইল তাহার বিপরীত। আন্দোলন আরো জোর পাইল। চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীরা দলে দলে কারাবরণ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বোম্বেতে যেদিন যুবরাজ অবতরণ করিলেন— মহাত্মা গান্ধী বোম্বেতে হরতাল ঘোষণা করিলেন এবং কংগ্রেস ঘোষণা করিল যে যুবরাজ যেখানে যেখানে যাইবেন, সেখানে হরতাল হইবে। যুবরাজের সম্বর্ধনায় ভারতবাসী কোন অংশ গ্রহণ করিবে না—তবে জনতাকে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল যে যুবরাজের প্রতি যেন

অপমান বা অভদ্রোচিত কাজ করা না হয়। কলিকাতায় যুবরাজের আসিবার দিনে—সেইরূপ হরতাল ঘোষণা করা হয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেস-পরিচালিত ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হরতাল বলিয়া জানা যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী নন—তাঁহারা এই হরতালের এরূপ সাফল্যের কথা ভাবিতেই পারেন নাই।

—"পথে কোন লোক নাই—যানবাহন, ট্রাম (তখনও বাসের আমদানী হয় নাই) চলাচল বন্ধ।

কালিঘাট হইতে শিয়ালদহ পৌঁছিতে কোনরকমে কালিঘাট-ফলতা রেলে চাপিয়া শিয়ালদহ পৌঁছান গেল। শিয়ালদহে দেখা গেল—ষ্টেশনের কুলি মজুর কেহ নাই, ষ্টেশন খাঁ খাঁ করিতেছে, রাস্তার দুইধারে দোকানপাট সব বন্ধ—শিয়ালদহের মোড়ে ২।১ খানা ট্রাম দাঁড়া করিয়া মহারাজা মণীন্দ্র নন্দী, নাটোরের মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রভৃতি রাজামহারাজারা ট্রামে বসিয়া—ট্রামে চাপিয়া ময়দানে যাইবার জন্য লোক ডাকিতেছেন। ময়দানে সকাল ৯টার সময় যুবরাজের সামনে "রিভিউ" ([illegible] নামে) অনুষ্ঠান হইবে—তাহাতে যোগ দিবার জন্য। লোক কেহ আসিতেছিল না। তাঁহাদের সাথে ট্রামে চাপিয়া ময়দানে পৌঁছান গেল। ময়দানে পৌঁছিয়া দেখা গেল ময়দান জনশূন্য। সমস্ত বড়বাজারের দোকানপাট বন্ধ—এসপ্লানেডে কেবল

সাহেবী দোকান ও হোটেল খোলা। স্যার সুরেন্দ্র ব্যানার্জী মহাশয়ে উপস্থিত থাকিয়া ভিখারী খাবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। শেষে যে আসিবে তাহাকে নগদ ৫৲ টাকা দেওয়া হইবে—ঘোষণা করিয়া চারিদিকে লোক ছুটিল, তথাপি কোন ভিখারী আসিল না। পরে বিলিতি হোটেলের বয় খানসামা ও রাজারাজড়াদের খিদমতগার চাকর বাকর—মোট একশতর উপর নহে—লোক আসিল। ইতিমধ্যে যুবরাজ আসিলেন, আসিয়া কলিকাতায় তাঁহার সর্বনাশ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। ওদিকে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী ও রাজারাজড়াদের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।"

এমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল কেহ দেখে নাই। চিত্তরঞ্জনের কারাবরণের পর এই আন্দোলন—জনতার হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল ও তাহাদের আত্মসম্মান এমন জাগ্রত করিয়াছিল যে নগদ ৫৲ টাকা দক্ষিণা ও প্রচুর ভোজের (চিঁড়ে মুড়ি নহে—খাঁটি খাঁটি লুচি সন্দেশ লেডিকেনী ইত্যাদি) লোভ দেখাইয়াও কলিকাতা শহরে খাইবার লোক পাওয়া গেল না।

চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর হৃদয় এইভাবেই জয় করিয়াছিলেন। আমাদের কথার এই অসাধারণ সাফল্যের সাক্ষী আছেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও প্রিন্সের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা (লর্ড

বংশের) কয়েক জন যুবরাজের পার্ষদ (A. D. C) হইয়া যুবরাজের সহিত আসেন।

লেডি মাউন্টব্যেটনও এই উপলক্ষে ভারতে আসেন। এই সূত্রে উভয়ের আলাপ পরিচয় হয় এবং পরে তাঁহারা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন।

আমেদাবাদ-কংগ্রেস

১৯২১ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন। তিনি তখন জেলে। তখন চিত্তরঞ্জনের নাম ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে ধ্বনিত হইতেছে। আমেদাবাদ সহরে, বোম্বে পুনা সর্বত্র, চিত্তরঞ্জনের ছবি—পথে—দোকানে বিক্রি হইতেছে।

হাকিম আজমল খাঁ—এই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

কংগ্রেসের চেহারা যেন সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি একদম বদলাইয়া গিয়াছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে—ফরাস-পাতা চট মাদুরের উপর। আর কংগ্রেস-সভাপতি ও নিখিল ভারত কমিটির সভ্যরা থাকে বসিয়াছেন—ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া—সামনে লিখিবার হাত-টেবিল। চেয়ার-টেবিলের বালাই নাই—বিদেশী সাজ-সজ্জার কোন চিহ্ন নাই। এতদিন পরে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারত তাহার বিস্মৃত শিক্ষা সংস্কৃতি ফিরাইয়া পাইয়াছে।

আমেদাবাদ-কংগ্রেসের পূর্বেই সুভাষও কারাবরণ করিয়াছে। বাংলার অর্ধেক নেতাই তখন জেলে।

দেশব্যাপী জাতীয় উত্তেজনা ও দৃঢ়সঙ্কল্পের মধ্যে আমেদাবাদ-কংগ্রেস শেষ হইল।

স্বরাজ্য-দল গঠন

দেশবন্ধু জেলে থাকিতেই কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে আবার দলাদলি সুরু হয়।

স্কুল কলেজ আইন আদালত বর্জন করিয়া অসহযোগ আন্দোলন আগাইয়া চলিতেছে। এখন প্রশ্ন, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া কাউন্সিল প্রবেশ চলিবে কিনা? বিরোধী দল বলিলেন, কাউন্সিলে না গেলে আমলাতন্ত্র যা' তা আইন পাশ করিবে—আমরা বাহির ও ভিতর হইতে আমলাতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করিব। কিন্তু অসহযোগের কর্মসূচী অনুযায়ী কাউন্সিল-প্রবেশ—তাহার আওতায় আসে না।

ছ' মাস পরে দেশবন্ধু জেল হইতে বাহির হইলেন। দেশবাসী একান্ত সমাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করিয়া তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিল।

দেশবন্ধু পরবর্তী গয়া-কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এদিকে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া দেশবন্ধুর সহকর্মীরা তাঁহার সম্মুখে কাউন্সিল-প্রবেশ কর্মসূচী

শেষ করিলেন। দেশবন্ধু কাউন্সিল-প্রবেশ অনুমোদন করিলেন। এদিকে গয়া-কংগ্রেস আসন্ন।

গয়া-কংগ্রেসে সভাপতির আসন হইতে দেশবন্ধু বলিলেন, "যাঁহারা মনে করেন যে অহিংস অসহযোগকারীরা কাউন্সিলের সভ্য হইলে—তাঁহাদের অসহযোগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিলে অনেকটা সেই রকম মনে হয় বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা' নয়। আমার মতে অসহযোগকারীদের আরও বেশী করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করা উচিত। এতে অসহযোগ আন্দোলনের যতটা সুবিধা হইবে—বাহিরে থাকিলে তাহা হইবে না। আমরা কাউন্সিলের ভিতরে থাকিলে গভর্ণমেণ্টের ঘরের কথা অনেক কিছু জানিতে পারিব। তাহা ছাড়া দেশবাসীর বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করিতে গেলে আমরা তাহাতে বাধা দিতে পারিব।"

গয়া কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল।

অদ্ভুত সৃজনীশক্তি

দেশবন্ধু কংগ্রেস হইতে বাহির হইলেন না—কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই বিরাট প্রতিপক্ষ (অপজিসন) দল খাড়া করিলেন—স্বরাজ্য-পার্টি, এবং সারা ভারত ভ্রমণ করিয়া স্বরাজ্য-দলের স্বপক্ষে জনমত গঠন করিলেন।

পণ্ডিত মতিলাল আগাইয়া আসিলেন—বোম্বে আসিল, আসিল পাঞ্জাব।

দেশবন্ধু হইলেন স্বরাজ্য-পার্টির প্রেসিডেন্ট, আর পণ্ডিত মতিলাল হইলেন সেক্রেটারী। সমস্ত ভারতে স্বরাজ্য-দলের শাখা স্থাপিত হইল ও সারা ভারতে কাউনসিল-প্রবেশ নীতি মানিয়া লইয়া ভিতর হইতে আমলাতন্ত্রকে আঘাত হানিবার বন্দোবস্ত হইল।

কাউনসিল-প্রবেশ লইয়া কংগ্রেসে দুই দল হইল—"ভেজালহীন আদি ও অকৃত্রিম" অসহযোগীরা "নো চেঞ্জার" নামে খ্যাত হইলেন, আর কাউনসিল-প্রবেশের সমর্থক চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য-পার্টির নাম হইল "প্রোচেঞ্জার"।

ভারত-সন্ধানী

পণ্ডিত নেহরু (জহরলাল) তাঁর বইতে (Discovery of India) চিত্তরঞ্জনের নাম করেন নাই। কেন যে ভারতসন্ধানীর সন্ধানী আলোতে ভারতের অন্যতম 'জাতির জনক' চিত্তরঞ্জনের নাম বাদ গেল—ভাবিতে বিস্ময় লাগে।

তারপর প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার স্ব-প্রকাশিত আত্মজীবনীতে "নোচেঞ্জার" "প্রোচেঞ্জারের" উল্লেখ করিয়া দেশবন্ধুর নাম প্রসঙ্গক্রমে (by the bye) উল্লেখ করিয়াছেন।

অথচ তিনিই কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট শক্তিশালী দল গড়িয়া তোলেন এবং সমস্ত ভারত তাহা মানিয়া লয়।

ঘটনা দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিতেছে—বৃটিশ-শাসকেরা দিশাহারা হইয়া নানাবিধ পীড়নমূলক আইন পাশ করিতে লাগিলেন।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার দল বে-আইনী ঘোষিত হইল। কিরণশঙ্করবাবু প্রমুখ বিশিষ্ট সংগঠনকারী নেতারা কারাবরণ করিলেন এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার দলের সভ্য হিসাবে।

দেশবন্ধু পুরুষ সিংহের মত গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন—আর তোমাদের এক পা' এগুতে দিব না—"This far, no further!

কি স্থানীয় (Local) মিউনিসিপ্যালিটি, কাউন্সিল—সর্বত্র নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের প্রার্থী তিনি সারা বাংলায় খাড়া করিলেন। অপূর্ব সাফল্য লাভ করিলেন—কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে।

১৯২৪ সালে "ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল এক্ট" পাশ হয়। তাহাতে বর্তমান কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, অল্ডারম্যান, প্রধান কর্মী প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয় ও নাগরিক জীবনের ব্যাপক প্রসার হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য-পার্টি কর্পোরেশনের প্রায় সমস্ত আসন দখল করিয়া এই নির্বাচন পরিচালনা করেন। সুভাষচন্দ্র তখন তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নতুন আইন অনুযায়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হন প্রথম নির্বাচিত মেয়র—১৯২৪ খৃ, ২৪শে এপ্রিল। সুভাষচন্দ্র হন কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা।

দেশবন্ধু মেয়র হইয়াই কর্পোরেশনে আইন পাশ করেন—প্রাথমিক শিক্ষা কলিকাতা সহরে হইবে অবৈতনিক।

আজ তাঁহার কৃপায় শতসহস্র বালক বালিকা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে। কর্পোরেশন তাহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেছে।

কর্পোরেশন-নির্বাচনের সাফল্যে সর্বভারত তাঁহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিল।

তারপরে কাউনসিলের নির্বাচন।

এই কাউনসিলের নির্বাচনে দেশবন্ধু খাড়া করিলেন—রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর প্রতিদ্বন্দ্বী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন ডাক্তার হিসাবে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের

সন্তান, পিতা তাঁহার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ছাত্র হিসাবে বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছেন। পরে বিলাত হইতে ডাক্তারী বিদ্যার সর্বোচ্চ ডিগ্রী এফ—আর সি এস উপাধি লইয়া আসেন। ডাক্তার হিসাবে তাঁহার নাম যশ ছিল ও তাঁহার ফীও মোটা ছিল, তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি তখন অজানা ছিলেন।

আর খাড়া করিলেন সাতকড়িপতি রায়কে বিজয় ভ্রাতা এস আর দাশের বিরুদ্ধে। এই রকম আরো অনেকে।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে ভোটযুদ্ধে হারাইয়া দিলেন—আর সাতকড়িপতি রায় দিলেন হারাইয়া এস আর দাশকে।

সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর নির্বাচনে পরাজয় আর ডাঃ বিধানচন্দ্রের জয়ে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগরণ পড়িয়া গেল। সকলেই স্বীকার করিল—অদ্ভুত দূরদর্শী এই চিত্তরঞ্জন।

চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য-দল গঠন ও নির্বাচনে এইরূপ অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়া ভারতের রাজনীতির মোড় ঘুরাইয়া দিলেন। মহাত্মাজী মোটেকার লইয়া চরকার অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন।

বাঙলায় অতিনিরক্ষর মহকুমা হইতে কাউন্সিল কর্পোরেশন—সর্বত্র স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠা হইল।

সর্ব্বত্রই স্বরাজ্যদল ঐ সব প্রতিষ্ঠানে জয়ী হইয়া সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেন।

চিত্তরঞ্জন দেখাইলেন—এই বাঙ্গালার ক্ষমতা করায়ত্ত না হইলে—বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটান যাইবে না।

তিনি কাউন্সিলে গভর্ণমেণ্ট-পক্ষকে "অচলাবস্থা" Dead lock করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আইন পাশ করিবার পথ বন্ধ করিলেন। মন্ত্রীদের বেতন হ্রাস করিলেন ও তিনবার কাউন্সিলের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এত বেশী ছিল যে তাঁহার অসুস্থতার সময় তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলে এক বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স—বিনা বিচারে আটক 'কালা আইন' পাশ করিতে পারে খবর পাইয়া চিত্তরঞ্জন ইজিচেয়ারে বাহিত হইয়া কাউন্সিলে উপস্থিত হন এবং তাহার উপস্থিতিতে ঐ আইন পাশ হয় না।

এদিকে অসহযোগ, বিশেষ করিয়া অসহযোগের অর্থনৈতিক দিকে মহাত্মাজীর একাগ্র সাধনার চরকা ও সূতা-কাটার ভারতব্যাপী "খাদি প্রতিষ্ঠান" কার্য্যকলাপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ভারতে লক্ষ লক্ষ হাতে কাটা সূতা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সময়ে আমেদাবাদ ও বোম্বেতে অনেক কাপড়ের কল স্থাপিত হইল।



স্বাস্থ্য-ভঙ্গ

১৯১৭ হইতে ১৯২৪ পর্য্যন্ত এই আট বৎসর দেশের জন্ত ক্রমাগত খাটিয়া চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। স্বরাজ্যপার্টি গঠন উপলক্ষে বাঙলার প্রতি জেলায় জেলায় (তখন অখণ্ড বাঙলায় ২৫টি জেলা) সর্ব্বত্র তিনি বিপুল সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন—জনসভাতে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং রাত্রে স্বেচ্ছাসেবক, কংগ্রেসকর্ম্মী ও স্থানীয় ভদ্রলোকদের সাথে আলোচনা-সভা করিয়া তাঁহাদের নিজমতে আনিয়াছেন। মুহূর্ত্ত বিশ্রাম পান নাই। তার উপর কর্পোরেশন ও কাউন্সিলে প্রবেশ লইয়া কলিকাতায় থাকিলে মুহূর্ত্তের জন্ত বিশ্রাম ছিল না। কাউন্সিলার, এম, এল, এ ও কমিশনার এবং তাঁহার সহযোগীদের সহিত গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ আলোচনা করিয়া কর্ম্মসূচী ঠিক করিতেন। তিলক স্বরাজ্যফণ্ডের সময় বাঙলার দেয় অংশ ১২ লাখ টাকা তিনি ৭ দিনে উঠাইয়া দেন।

তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও স্বরাজ্যদলের সভাপতি—তাঁহার বিশ্রামের সময় কোথায়? কিন্তু দেহ তাহা মানিবে কেন? স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহার ফুসফুসে জল দেখা দিল।

ডাঃ বিধান রায় দেখিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আছেন ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত। তাঁহারা বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ছিলেন। দেশবন্ধু পাটনায় তাঁহার ভাই পি, আর দাশের (তখন পাটনা হাইকোর্টের জজ) বাড়ী গেলেন। পি, আর, দাশ—তাঁহার পিতা ভুবনমোহন দাশের ভ্রাতা দুর্গামোহন দাশের পুত্র। দেশবন্ধু ও পি আর দাশ, এস আর দাশ—ইঁহারা খুড়তাত ভাই, একপরিবার ও খুব ঘনিষ্ঠ পারিবারিক মমতায় আবদ্ধ ছিলেন। পি আর দাশ বিলাত যান—ইনি মেম বিবাহ করেন।

অপর্ণা দেবী তাঁহার মেমখুড়িমা-বধূবরণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "আমাদের পুরুলিয়ার বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল—যে কাকামণি (পি আর দাশের) মেম-খুড়িমা আনিবেন। মেম-খুড়িমার জন্য সব ঘর সাহেবী কায়দায় সাজান হইল। দিদিমা বধূবরণের জন্য বেনারসী শাড়ী, সিঁদুর, শাঁখা ও লোহা দিবেন ঠিক হইল। আর আমরা ছোটরা মেমখুড়িমার জন্য বড় বাজোর এসেন্সের শিশি—বেশীর ভাগই সবুজ, জড় করিলাম। আমাদের ধারণা, মেম যখন নিশ্চয়ই এসেন্স ভালবাসেন।

মেমখুড়িমা আসিলেন। আমরা শাঁখ বাজাইয়া তাঁহাকে বরণ করিলাম। দিদিমা মেমখুড়িমাকে শাড়ী, শাঁখা, সোনার বালা পরাইলেন। এই সাজে মেমখুড়িমা

যত দিন বাঁচিয়াছিলেন বজায় রাখিয়াছিলেন।" পি আর দাশ মহাশয়ের পারিবারিক জীবনের এই পরিবেশ। তিনি ভারতের মধ্যে প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার। গান্ধীজীর হত্যার মামলায় বীর সাভারকরকে তিনিই খালাস করেন।

পাটনায় পৌঁছিয়া দাশ সাহেবের বাড়ী গিয়া দেখি উপরে খুব কীর্ত্তন হইতেছে। দুই ভাই কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। দাশসাহেব (পি আর দাশ) বৃন্দাবনের জনৈক প্রখ্যাত মোহান্তের নিকট হইতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা লইয়াছেন।

কাজের কথা বার্ত্তা, বোধ হয় ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণ সম্বন্ধে, শেষ করিয়া পরদিন কলিকাতা আসি। তিনি গিরিজাবাবুর (গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর) সহিত দেখা করিতে বলেন।

ফরিদপুর কনফারেন্সের খুব গুরুত্ব ছিল। মহাত্মা গান্ধী ঐ কনফারেন্সে স্বয়ং উপস্থিত। তাহা ছাড়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এই সময় দেশবন্ধুর সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতেছিল বলিয়া প্রকাশ। তবে দেশবন্ধু বলিতেন, পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া আমরা অন্য কোন আপোষে রাজী নই।

এই সময় লর্ড লিটন বাঙলার গভর্ণর। ইনি ইহার পিতামহ প্রখ্যাত লর্ড লিটনের পুত্র—তিনি

ভারতবাসীকে প্রেস আইনের নিষ্পেষণ হইতে বাঁচাইয়া স্বাধীন জনমত গঠনের সুযোগ দিয়াছিলেন ও ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের (মিউনিসিপ্যালিটি) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ফরিদপুর কনফারেন্সে আসেন এবং ভোরে ময়দানে ভ্রমণরত এক সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছোড়েন—তাহাতে সাহেব মারা যান।

এই কংগ্রেস ও রাজনৈতিক কনফারেন্সে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি করা হয়। সুভাষবাবু তিন আইনে তখন বন্দী। তিন আইনে বন্দীদের মুক্তি-দাবি বিষয়-নির্বাচনী সভা পাশ করিল। কিন্তু হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য যাহারা বন্দী তাঁহাদের মুক্তির দাবী প্রসঙ্গে বৈধতা সম্বন্ধে বিতর্ক উঠে। আর যায় কোথা? সমস্ত কংগ্রেস-কর্মী দলবদ্ধ হইয়া ভূপতি মজুমদারের নেতৃত্বে ইহার প্রতিবাদ করেন ও উক্ত বৈধতার প্রশ্ন বাতিল করিয়া, হিংস অহিংস সব রাজবন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব পাশ করেন।

দেশবন্ধুর সভাপতিত্বের পর এই হিংসা ও অহিংসা লইয়া বিতর্ক আজিও চলিতেছে, সেজন্য "ভারতসরকারী" তাঁহার সন্ধানী আলোতে দেশবন্ধুকে দেখিতে পায় নাই। আর সেজন্যই ভারতের সরকারী (official) ইতিহাস

লেখা বন্ধ হইয়া গেল—শোনা যায়, নেতাদের কর্ণধারের বৈধতার প্রশ্নে।

ফরিদপুর কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু অসুস্থ শরীরেই কলিকাতায় ফিরিলেন।

সর্ব্বস্ব-দান

এটা ১৯২৫ সাল। তাঁহার একবৎসর পূর্ব্বে দেশবন্ধু তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব রসা রোডের বাড়ী দান করেন—প্রসূতি-কল্যাণের জন্য (Matornity Home), যাহা এখন চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামে বিখ্যাত। এক কপর্দ্দক নিজের জন্য না রাখিয়া, তিনি ঐ সঙ্গে তাঁহাদের পুরুলিয়ার বাড়ী পর্য্যন্ত দান করেন। সেখানে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপিত হয়। এইভাবে জনহিতের জন্য সর্ব্বস্বদান আজ পর্য্যন্ত ভারতে কেহ করেন নাই—জগতেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল।

সর্ব্বস্ব দান করিয়া দেশবন্ধু ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন।

অসহযোগে যোগ দিয়া দেশবন্ধু আহারাদির আমূল পরিবর্ত্তন করেন—এমন কি চা পর্য্যন্ত খাওয়া ছাড়িয়া দেন। চায়ের বদলে খাইতেন গরম জল। আর যাঁহার বাড়ীর নিত্য বাজার খরচ ছিল একশত টাকা—মাছ, মাংস, ফল, সন্দেশ প্রভৃতি ভোজ্য-দ্রব্য প্রত্যহ বিপুলভাবে আসিত, যাঁহার বাড়ীতে নিত্য ভোজনোৎসব চলিত, সমস্ত দান

করিয়া নিতান্ত সাদাসিধে ভাবে তিনি অন্নপান গ্রহণে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন। পুষ্টির অভাবে ও গুরুতর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

দার্জিলিঙ

ফরিদপুর হইতে ফিরিয়া দেশবন্ধু ডাক্তারদের পরামর্শে দার্জিলিঙ যান। দার্জিলিঙ যাইবার জন্য উত্তরপাড়ার জমিদারের (বোধ হয়, তারক মুখুজ্যের) নিকট পাঁচশত টাকা ধার করিয়া-যাইবার খরচ ও তথায় বাসের খরচের টাকা সংগ্রহ করেন।

যিনি সর্বস্ব দান করিয়াছেন—তাঁহার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্তনের খরচের জন্য আজ অন্যের নিকট হাত পাতিতে হইল। ইহা কি নিয়তির পরিহাস? না ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। এইরূপ সর্বস্বদান করিয়া যাহারা "বিশ্বজিৎ" যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন—তাঁহারা "আগামী কালের" জন্য কিছু সঞ্চয় রাখেন না। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব, তিনি তাঁহার প্রেমধর্মের আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছায় এই সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন।

মহাপ্রভু তখন নীলাচলে (পুরীতে)—গৌড় বাংলা হইতে অগ্রদ্বীপের এক ঘোষ—তাঁহার স্ত্রীপুত্র একদিনে মহামারীতে মারা যায়, তিনি মহাপ্রভুর শরণ নেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দেন।

তাঁহার সেবায় মহাপ্রভু পরম সন্তুষ্ট। একদিনের অতি ছোট একটি ঘটনা মহাপ্রভু দ্বিপ্রহরে ভিক্ষান্তে তাঁহাকে বলিলেন—বৈ, আজ তো তুমি আমার মুখশুদ্ধি দেও নি। সেবক ঘোষ তখনি ঝোলা হইতে হরিতকী বাহির করিয়া মহাপ্রভুকে দিলেন, মহাপ্রভু তাহা দিয়া মুখশুদ্ধি করিয়া বলিলেন—আজ হতে তুমি এখান হতে চলে যাও।

সে কি কথা? ঘোষ তো কাঁদিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িল। তখনও তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তিনি এমন কি কঠোর অপরাধ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গ হইতে নির্বাসন দিতেছেন।

মহাপ্রভু বলিলেন—তোমার সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট—তবে তোমার "সঞ্চয়-বুদ্ধি" যায় নি। অতএব তুমি বাড়ী ফিরে যাও, সেখানে গিয়া ঘরসংসার কর।

প্রকৃত বৈষ্ণবের বা সত্যিকার সন্ন্যাসীর সঞ্চয় তো দূরের কথা—"সঞ্চয় বুদ্ধিও" মহাপাপ।

আমরা সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জন দেখিয়াছি, ব্যবহারক্ষেত্রে (ব্যারিষ্টারী) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবহারজীবী রূপে দেখিয়াছি, রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার দূরদর্শিতা ও বিরাট সাফল্য দেখিয়াছি, আজ তাঁহাকে ভারতীয় সন্ন্যাসীর ও প্রেমধর্মের মূর্ত্ত প্রতীকরূপে দেখিলাম—

একাধারে এরূপ বিরাট ত্যাগ ও ভোগের আদর্শ—জগতে বিরল। ভারতীয় সংস্কৃতির তিনি ছিলেন আধার। ভারতীয় সংস্কৃতি তাঁহার মধ্যে পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই জন্য সুভাষ তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়াছিলেন:—"এই সেই নেতা যিনি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন।"

বাঙ্গালী জাতিকে তিনি লক্ষ্যে—স্বরাজের পথে পৌঁছাইয়াছেন—সমস্ত ভারতকে দিয়াছেন সেই লক্ষ্যে পৌঁছিবার ইঙ্গিত ও পদ্ধতি—কাউন্সিল প্রবেশ দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করা।

দার্জিলিঙ গিয়া দেশবন্ধু প্রথম প্রথম ভাল বোধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে তাঁহার ছোট কন্যা ও জামাতা ডাক্তার মুখার্জ্জী ছিলেন। বাসন্তী দেবী তো ছিলেনই। এই সময় আমাকেও দার্জিলিঙ যাইতে হয়। তাঁহার মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে, মহাত্মা গান্ধী আসিবেন এই জন্য আমাকে ছাগলের দুধের ব্যবস্থার জন্য নীচে নামিতে হয় (জলপাইগুড়ি)। সে সময় হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁহার কাছে ছিলেন।

দেশবন্ধু ষ্টেপ এসাইড হইতে দু'বেলা রিক্সা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার রিক্সার পাশে থাকিতেন—তাঁহার জামাই ডাক্তার। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম।

হঠাৎ জ্বর বাড়িয়া যায় এবং তিনি আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়েন ও মাঝে মাঝে বলিতেন—'ঐ কে এলো, জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।'

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকেন।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরে সকলের আগে তিনজন অজ্ঞাত সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার শবদেহ ফুল দিয়া পূজা করিয়া চলিয়া যান। এই চার জন সন্ন্যাসীর গায়ে গেরুয়া রঙের পরিধেয় ছিল না, ছিল—হলুদ রঙের, বৈষ্ণবেরা যাহা পরেন। ইহার পরেই সমস্ত দার্জ্জিলিঙময় তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে ও দলে দলে জনতা পুষ্পার্ঘ্য হাতে লইয়া তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসে। ১৬ই জুন ১৯২৫ সনে বিকেল ৫টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

ঐদিন সন্ধ্যা নাগাদ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সমস্ত দোকান-পাট, বড়বাজারের ব্যবসায়ী কেন্দ্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে বন্ধ হয়—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। সিনেমা হাউসে সেদিন 'শো' বন্ধ হয়।

রাজধানী কলিকাতা তাহাদের এই জনপ্রিয় নেতার শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে ও জনতা হতভম্ব হইয়া যায়।

বিরাট শবযাত্রা

১৭ই জুন—দার্জ্জিলিং মেলে তাঁহার শবদেহ কলিকাতা পৌঁছে। দার্জ্জিলিং মেল আসিবার বহু পূর্ব্বেই শেয়ালদহ ষ্টেশনের সমস্ত প্লাটফর্মগুলি লোকে লোকারণ্য—হ্যারিসন রোড, বৌবাজার, সার্কুলার রোড—অগণিত জনারণ্যে ছাইয়া যায় ও সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। বেলা ১০টা ১১টার সময় তাঁহার শবদেহের শবযাত্রা শেয়ালদহ ষ্টেশন হইতে বাহির হয় ও বহু রাস্তা ঘুরিয়া মধ্যে এসপ্লানেড হইয়া তাঁহার নশ্বর দেহ তাঁহার বাসবাড়ী ১৪৮ রসা রোডে চারি ঘণ্টা অবস্থান করে। মহাত্মা গান্ধী বরিশাল হইতে আসিয়া পূর্ব্বাহ্নে ১৪৮ রসা রোডে বাহিরে বসিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন।

আত্মীয়-স্বজন পরিবারের শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়া প্রায় ৬টার সময় দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা পরে বিপুল জনতা ও [illegible] শেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়া শবদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে আসে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তাঁহার চিতায় অগ্নিপ্রদান করা হয়। তাঁহার নশ্বর দেহ চিতার হোমাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে সত্য কিন্তু তাঁহার আত্ম-ত্যাগের দ্বারা বাঙ্গালী জাতিকে যে সংগ্রামী মনোবৃত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়া গিয়াছেন—

তাহা কখনো হয় নাই, কোন দিনও হইবে না। সেইজন্য কবিগুরু তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

জাতিকে সংগ্রামী মনোবৃত্তি দেওয়া ছাড়া—আর দিয়া গিয়াছেন—জাতিকে রাষ্ট্র-পরিচালনা শিক্ষা ও বাঙালীকে বাঙালী বলিয়া গৌরব বোধ করিবার দীক্ষা।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হইতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পর্যন্ত চিত্তরঞ্জনের আওতায় কাউন্সিল প্রবেশ কর্মসূচীতে রাষ্ট্র-পরিচালনা হাতে-কলমে শিক্ষা করিয়াছেন। সেইজন্য অরবিন্দ বলিয়াছিলেন—তাঁহার সময়ে ভারতে "চিত্তের মত কৌশলী ও দূরদর্শী নেতা ভারতে ছিল না।"

চিত্তরঞ্জন শুধু অসহযোগের পাঁচ দফা কর্মসূচী লইয়া থাকিলে আজ রাষ্ট্র-পরিচালনা বানচাল হইত।

ভারত-বিভাগের পর যখন স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন ষ্টেটে মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া রাষ্ট্রপরিচালনা শুরু হয়, তখন "নোচেঞ্জার" দলভুক্ত মহাত্মাজীর বিশিষ্ট কর্মী, ত্যাগীরূপে দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনিও বহু দুঃখবরণ করিয়াছেন। তিনি বাংলায় আসিয়া বাংলার স্থায়ী মন্ত্রীসভা চালাইতে পারিবেন না—যেহেতু তাঁহাদের সে-শিক্ষা ছিল না। তাঁহারা সমাজ-সেবক হইতে পারেন

বা অন্যান্য দিকে নিপুণ কর্মী হিসাবে কাজ করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা রাষ্ট্র-পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

অপর্ণা দেবী খেদ করিয়া বলিয়াছেন—"রসা রোডের বাড়ী নাকি এক বিধবার ছিল। জাতিয়া ফাঁকি দিয়া ডিক্রী করিয়া নীলামে বাড়ীখানা হস্তগত করে। বিধবা এইজন্য অভিশাপ দিয়াছিলেন—ও-বাড়ীতে যে বাস করিবে তাহার নির্বংশ হইবে।"

সে-বাড়ীতে এখনও নিত্য নবজাত শিশুর হাসি ও কান্নায় মুখরিত হইতেছে—তাহারা সকলেই তো চিত্তরঞ্জনের পুত্র। তাছাড়া তাঁহার জীবিত কালে বাড়ীতে যেরূপ নিত্য মহোৎসব হইত—আজিও তাহাই হইতেছে!

শিশির চৌধুরীকে (অধুনামৃত) দেশবন্ধু সেবাসদনের সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট করিয়া দেন। শিশির মৃত্যু পর্য্যন্ত (বোধ হয় বৎসর তিনেক তাহার মৃত্যু হইয়াছে) ঐ কাজে ছিলেন। বৎসর তিনেক আগে একদিন কোন রুগীকে ভর্ত্তি করবার উদ্দেশে শিশিরের নিকট গিয়াছিলাম। শিশির তখন সেবাসদনের রোজকার বাজার করিতে গিয়াছিলেন। ২।৩টি কুলীর মাথায় চাপাইয়া যখন তিনি বাজার করিয়া ফিরিলেন তখন দেখা গেল—ঝুড়িতে নানাবিধ তরকারী ও ফল-মেওয়া, আঙুর, আপেল পর্য্যন্ত, মধ্যে ৫০টি রুই মাছের মুড়ো।

আমি বলিলাম, এত বই মায়ের মুক্তো কে খাবে— এবে দেখছি—একেবারে "রাজসূয় যজ্ঞের" আয়োজন! শিশির তাহার দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, কর্ত্তা (আমরা দেশবন্ধুকে কর্ত্তা বলিতাম) থাকিতে এবাড়ীতে যেমন নিত্য আহারের বন্দোবস্ত ছিল জানেন তো, তাঁহার অভাবে আজও তাহা হইতেছে। তারপরে—শিশির বলিলেন, সদ্য ক্যান্সার রোগীর বিভাগ খোলা হইয়াছে, ও প্রসূতিদের ডাক্তারের ব্যবস্থামত এই মায়ের মুক্তো পথ্য দেওয়া হয়।

আজও তাঁহার বাড়ীতে সকালে রোজ ২০০শত লোক অন্ন ও প্রচুর ভোজ্য পাইতেছে—আর নবজাত শিশুর হাসি-কান্নায় তাঁহার বাড়ী মুখরিত হইতেছে।

কে বলে চিত্তরঞ্জন মারা গিয়াছেন? তিনি কাল-জয়ী! বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী এঁরা কখনও মরেন নাই, এঁরা চিরজীবী, জয়তু চিত্তরঞ্জন!

বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন

ভবানীপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় কনফারেন্সের সভাপতির আসন হইতে তিনিই প্রথমে বাঙ্গলার কথা বলেন এবং আজীবন এই অপরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী ও অনন্ত শক্তিময়ী দেশ মাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—আমার বাংলাকে আমি

আশৈশব প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার দৈন্ত, সকল অযোগ্যতা অক্ষমতা সত্বেও আমার বাংলার জীবন্ত মূর্ত্তি-আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আমি আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে এক অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি। বাঙ্গালীর একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে, বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাঙলাকে জানে না।

বাঙলার কথা কি আমরা ভাবি? দেশের আপামর সাধারণের সাথে আমাদের যোগ নাই, তাই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার বস্তুহীন।

বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বাঙলার মূর্ত্তি গড়িলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্"—তাঁহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ, দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।

কিন্তু আমরাতো সে গান শুনিলাম, সে মূর্ত্তি—দেখিলাম না, তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "আমি একা মা, মা, বলিয়া রোদন করিতেছি।"

তাঁহার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলিতেছেন—ইহা ভাব-লোলুপতা নহে—"বাঙলার যে জীবন্ত প্রাণ তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙলার ইতিহাসের ধারা কতকটা বুঝিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শৈব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি সবই যেন চক্ষুর সামনে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল, মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞান দাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচন দাসের গান সবই যেন একযোগে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে জাগিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরেজ এদেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কি? বঙ্কিমের সে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি—প্রাণাঃ শরীরে,
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

সেই মাকে দেখিলাম—চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।"

বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম কেশবচন্দ্র সেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম বাঙালী হিন্দু হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙালী—বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপা লীলাময়ীর রূপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে বাঙালী একটি বিশিষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার বাঙলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ! যখন জাগিলাম—মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন, সেরূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর, আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি!

চিত্তরঞ্জনের এই মাতৃরূপ দর্শন অদ্ভুত! তিনি মা বাঙলার রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তার পর

তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া—মাতৃপূজা আয়োজন করিয়াছিলেন।

পাঠক! গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন ও চিত্তরঞ্জনের মাতৃরূপ দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

শেষে অর্জুন আত্মহারা হইয়া বলিয়াছেন—ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব! তুমিই আমার সব। চিত্তরঞ্জন মায়ের মোহিনীরূপ দেখিয়া বলিয়াছেন—

"তুমিই আমার সব!" আর সেই রূপের সম্মুখে তাঁহার দুই চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া মা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন—বিরাট স্বরূপ—বাঙলার বৈশিষ্ট্য, বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য! সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জীবন আমার মাগো তোমায় ভালবেসে।

চিত্তরঞ্জনের জীবন-দর্শন

নেতাজী সুভাষ বলিয়াছেন—"মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিষ্টার, উদার প্রেমিক, পরম বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্‌বিজয়ী বীর হইতে পারে এ-প্রশ্ন অনেকের মনে উদয় হয়। আমি সূক্ষ্মবিচার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য হইয়াছি কিনা জানি না। আর্য, দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি।

আর্য্যের ধর্ম্মপ্রবণতা ও আর্য্যাবর্ত্ত, দ্রাবিড়ের কারু-শিল্প ও ভক্তিমত্ততা ও মঙ্গোলের যুক্তি-কৌশল বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গলার বাঙ্গলার সাগর-সঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে বাঙ্গালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক প্রকৃতি করিয়াছে। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুলচেরা তর্ক লইয়া কারবার। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুলচেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা অন্যপক্ষকে বিব্রত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নবীন বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য। ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এসব বর্জ্জনের কোনও প্রয়োজন নাই। মনুষ্য-হৃদয় নিত্য বৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের—রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিতেছে। তিনি রসময়, তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে।

বস্তুতঃ দেশবন্ধু বিবেকানন্দের মত মনুষ্য-জীবনকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি কথাবার্ত্তায় ও বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে,

রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, এসব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ হইবে না।

তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (Synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ, কোন প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়াই তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ ও গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে, সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন।

জগতের মূল আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। বাঙালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশী বলিয়া বাঙালী জাতি হিসাবে মাকে অন্তরে এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন লিখিয়াছেন—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

"বন্দেমাতরম্।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে—
উঠিলে জননী "ভারতবর্ষ"।

রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

ও আমার জন্মভূমি—তোমার পায়ে
ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর—তোমাতে
বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।

তখন তাঁহারা অন্তরোপবিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখিয়াছিলেন। দেশবন্ধুও মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। বঙ্কিমলিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর।

তাঁহার "নারায়ণ" পত্রিকায় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শক্তিধর্মেরও সেইরূপ আলোচনা হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলি উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ।

তাঁহার ধর্ম বাঙ্গালীর ধর্ম, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় গৌরব ছিল যে তিনি বাঙ্গালী।

তিনি প্রায়ই বলিতেন যে বাঙালার সব দোষগুণ লইয়াই বাঙালী। কেহ বাঙালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন। তিনি বলিতেন—"আমরা ভাবপ্রবণ, ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।"

তারপরে নেতাজী সুভাষ বলিয়াছেন—"সমুদ্রের উদ্বেলিত জলরাশির ন্যায় তিনি সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিয়াছেন। প্রিয়জনদের আর্তনাদ অথবা অনুচর-বর্গের সাবধান-বাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্য শক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লব্ধ? * *

তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন, তিনি যাহা করেন তাহা সর্বজীবের অনুরূপ। বৈষ্ণব ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তববাদী ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্য ওতপ্রোতভাবে তাঁহার কাব্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্ত লীলার অংশরূপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়। অহংকার লোপ পাইলে মানুষ বিশ্বশক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তাঁহার শক্তির নিকট

সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশবন্ধুরও হইয়াছিল তাহাই, তাঁহার জীবনের শেষদিকে প্রবল শত্রুরাও তাঁহার সম্মুখীন হইয়া যেন জড়পুত্ত হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশ এই ধারণা জন্মিতেছিল—বড় দাশ মহাশয় অজর জয়।

বাঙলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু সেইরূপ ছিলেন।"

পরে বলিতেছেন—"দেশবন্ধুর দেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে। কবে ফিরিয়া পাইবে—ভগবানই জানেন।"

দেশবন্ধুর জীবন-দর্শন বাঙলার, বাঙালী জাতির তথা জীবনদর্শন।

আজ বাঙালী জাতি সে জীবন-দর্শন হারাইয়া, পরাধীনতার সম্মোহনে নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য সব বিসর্জন দিয়া আঁধারে ঘুরিয়া মরিতেছে।

সাহিত্য-সেবায় চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধুর সাহিত্য-সাধনা তাঁহার সমগ্র জীবনের অনুভূতি। তাঁহার বাল্যকাল হইতেই লেখা ও বক্তৃতায় বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিলাত হইতে

ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পর তাঁহার বিবাহ ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের নীতিবাগীশদের কথায় 'নাস্তিক ও মাতাল' তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত দেয়। বিলাত হইতে ফিরিবার সময় তিনি তাহাকে "সাগর-সঙ্গম" দেখেন।

তিনি কবি। তাঁহার প্রথম কবিতার বই 'মালঞ্চ' ১৩০৩ সালে সাহিত্য প্রেস হইতে "সাহিত্য" সম্পাদক ৺সুরেশ সমাজপতি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

মালঞ্চ প্রকাশিত হইবার পরে বাংলা-সাহিত্যে চিত্তরঞ্জনের কবিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ও চারিদিকে আন্দোলন ও সমালোচনা সুরু হয়। এই মালঞ্চের একটা কবিতা "বারবিলাসিনী।"

কবি বলিতেছেন—আজ আমার স্পর্শে তোমার "সব বল দূর"? কিন্তু আমার?

"যাহা আছে সব লও তুলে,
বেঁধে দেও রক্তমালা,
তুলে নিও পুষ্পমালা,
রজনীর প্রভাতে দেও ঢলে।"

পরে রজনী প্রভাত হইলে—

"তুমি দেও ওগো উষারাণী
পূণ্য দেহে শুভ্র হাসে
পশিও পবিত্র বাসে—
তবু আমি হব কলঙ্কিনী।"

• • •

"কার অভিশাপে নাহি জানি,
কোন মহাপাপে হায়
পিয়েছিনু, তাই দেখা
আপনহীন প্রেমবিলাসিনী।
সবার বিলাস তাই বারবিলাসিনী—
তারি মাঝে চির-কলঙ্কিনী।"

এই সময় হুডের বিখ্যাত কবিতা "The Bridge of Sighs—বিলাতে বিশেষ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল।

একটি হতভাগিনী যুবতী লণ্ডনের ঐ কুখ্যাত 'ব্রিজ' বা "সেতু" হইতে ঝাঁপাইয়া টেমস নদীতে পড়িয়া আত্মহত্যা করে। ঐরূপ আরো অনেকে ঐ "ব্রিজ" হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে, সেজন্য ঐ সেতুর নাম দীর্ঘশ্বাসের সাঁকো—"The Bridge of Sighs. কবি-হুড বলিয়াছেন—ঐ মেয়েটির মৃতদেহে গোলাপ ফুল ছড়িয়ে দেও, দিও না 'ইউয়ের' পাতা।

ইউ-গাছের পাতা কবরে দেওয়া হয়।

এই Bridge of Sighs কবিতার সমালোচনায় কবি চিত্তরঞ্জন বলিয়েছেন—"পতিতাদের দুর্দশার জন্য পুরুষ কম দায়ী নয়। তাহাদিগকে ঘৃণা করিবার অধিকার কাহারও নাই।"

মালঞ্চের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাহির হয়।

বঙ্গ-কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রতি কবি চিত্তরঞ্জনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। কবি চিত্তরঞ্জন তাঁহার উদ্দেশে একটী সনেট লিখিয়া কবিবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানান।

দেশবন্ধু-রচিত সনেট—

"তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি
সুখভরা, শান্তিভরা স্বপনভরা ছবি
রাগভরা বাক্য আর রঙ-ভরা হাসি,
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট,
আমার আগ্রহভরা ভিখারী সনেট।"

মালা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে মালার তিনটি কবিতা "সাহিত্যে" প্রকাশিত হয়। তাহার 'চাঁদ' কবিতাটি— 'কবিতা ও প্রিয়া' নামে বাহির হয়—

"কবিতা কবির আশা, তাই জানে চাঁদে,
তুমি মোরে দিলে চাঁদ, কে জানে
কে জানে?"

"প্রেম-প্রতীক্ষায়"—কবি বলিতেছেন—

"কোন পথ নাহি হায়, প্রিয়া আসে নাই ;
প্রিয়ার কুন্তল সম এসেছে রজনী।"

"সান্ত্বনা" কবিতায় কবি বলিতেছেন—

"বুঝিনা জনম-ভার আমি বিহ্বলের

যত সৌন্দর্য্য আছে যত না স্বপন
সর্ব্ব কোমলতা মোর আজি পেতে দিব
তুমি কর—ওগো কর—আমারি জীবন
তোমার চরণ ভূমি।"

'মালা'তে কবি চিত্তরঞ্জন তাঁহার অন্তরের সাধনায় শুধু আভাষ দেন না, তাঁহার অন্তরতমের গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেন—মালা তাঁর "কিশোর-কিশোরী" প্রেমের পূর্ব্বরাগ।

"ওই তব প্রদীপের আলো অন্ধকারে
কোথা তুমি লুকাইয়া আছ খুঁজিবারে।
হে মোর লুকান ধন! হে রহস্যময়ি,
আলো অন্ধকারে জ্বলা প্রদীপে তোমার
সকল বেরাম তব সকল ধরম
সকল আলোকে ওগো সকল আঁধারে।"

"সাগর-সঙ্গীতে"—কবি বলিতেছেন—

"হে আমার আশাতীত হে কৌতুকময়ি,
দাঁড়াও ক্ষণেক, তোমায় ভরে দেখে লই
আজি সারা সিন্ধু ঐ ম্লানচন্দ্র করে
কহিতেছে—উন্মন ফিরে ক্ষণতরে!
সবাই এসেছে আজি হে রহস্যময়ি
দাঁড়াও ক্ষণেক, আজি হৃদে দেখে লই।

দাঁড়াও ক্ষণেক আমি অর্ঘ্যের সাথে
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের ভাবে
ছন্দাতীত ছন্দে আমি তোমারে বাঁধিব
অন্তরে বিজনে আমি তোমারে রাখিব
তুমি কি রবে না সেথা হে স্বপ্ন-কল্পনা,
ছন্দবদ্ধ, পরিপূর্ণ নিত্য অচঞ্চলা !"

সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন

১৩২১ সালে "নারায়ণ" পত্রিকা বাহির হয়। এই পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়), দীনেশচন্দ্র সেন (ডি লিট), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও অন্যান্য তদানীন্তন নামকরা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা লিখিতেন।

নারায়ণে চিত্তরঞ্জনের 'ডালিম' নামে একটি গল্প বাহির হয়। "ডালিম" গল্পটির বিষয়বস্তুর বাস্তব ভূমিকার জন্য সর্বজনপ্রিয় হয়, আবার নীতিবাগীশদের কঠোর সমালোচনাও লাভ করে।

বেলুড়-মঠের উৎসবে দেশবন্ধুর সহিত শরৎচন্দ্রের দেখা হয়। শরৎচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ছোট গল্পও লেখেন!

দেশবন্ধু হাসিয়া বলেন—

"সে দুঃসাহসও রাখি।"

১৩২২ সালের নারায়ণে দেশবন্ধুর "প্রাণপ্রতিষ্ঠা" গল্প বাহির হয়।

"নারায়ণে"—শরৎচন্দ্রের "স্বামী" গল্প প্রকাশিত হয়।

সঙ্গীত-রচয়িতা

—চিত্তরঞ্জন অনেক গান লিখিয়াছেন, সেগুলি সুর-সংযোজনা করিয়া শুনিতে ভালবাসিতেন।

'বাহিরে দেও জ্ঞানের বোঝা'—তাঁহার রচিত গানে দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুর-সংযোজনা করেন।

নিম্নলিখিত গান দুটি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল—

১। মেঘের মাঝে ঐ যে ভাসে
নীলসাগরের নীলমণি।
ঐ যে ডাকে ঐ যে হাসে
নীল সাগরের নীলমণি।

২। ওগো আমার উজল বরণ
কেন লুকাও মেঘের মাঝে,
ওই তুমি কাছেই আছ
ওই যে তোমার নূপুর বাজে।

এইবার চিত্তরঞ্জন তাঁহার অন্তরের মাঝে অন্তরতমের দেখা পাইয়াছে—উপনিষদের ভাষায় "যং লব্ধা নাপরং লাভম্"—যাকে পেলে আর কোন লাভই (ঐশ্বর্য)

লাভ করে হয় না। বৃন্দাবনের সেই চিরকিশোর-কিশোরীর সাক্ষাৎ তিনি পাইয়াছেন।

বাংলার ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক ঘটনার সমষ্টির ইতিহাস নয়। অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলন চিত্তরঞ্জনের সমাজ-জীবনের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস বাংলার তখনকার সমাজ-জীবনের প্রকৃত ইতিহাস—যাহার মধ্যে তখনকার দিনের বাঙলার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ—যথা রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। অতএব "নারায়ণ"-এর প্রকাশিত সংখ্যাগুলি বহিয়ের "বঙ্গদর্শনের" মত পুনঃ প্রকাশ করা উচিত এবং এই কাজের গুরু-দায়িত্ব একমাত্র গিরীজাশঙ্কর রায়চৌধুরীই গ্রহণ করিতে সক্ষম। গভর্ণমেন্ট অনুরূপ অনেক সাহিত্য বই প্রভৃতি প্রকাশে সাহায্য করিতেছেন—বাঙলা-গভর্ণমেন্টের অবিলম্বে এদিকে হাত দেওয়া উচিত।

বর্তমান বাঙলা গভর্ণমেন্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশন চিত্তরঞ্জনের অনুগামী শিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত।

একদিন বাঙলা-সরকার কেন যে এই কাজে হাত দেন নাই তাহাই পরিতাপের বিষয়।

মানুষ চিত্তরঞ্জন

মানুষ হিসাবে চিত্তরঞ্জনের মহৎ কাজ তাঁহার পিতৃঋণ শোধ দেওয়া। তাঁহার পিতা ভুবনবাবু ঋণবিব্রত হয়ে দেউলিয়া হন। তাঁহার পিতৃঋণের পরিমাণ ছিল চৌষট্টি হাজার টাকার উপর। চিত্তরঞ্জন তাঁহার পিতার কৃত সমস্ত দেনা নিজে হ্যাণ্ডনোট দিয়া আবার নতুন করিয়া ঋণ নেন ও উক্ত দেনার জন্য নিজে দেউলিয়াও হন।

দীর্ঘ ১৮ বৎসর নিজ জীবনে কঠোর সংগ্রাম—স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য বরণ করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যে মাসে পিতার সমস্ত ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দেন।

হাইকোর্টে দেউলিয়া কোর্টে তখন জজ ছিলেন ফ্লেচার সাহেব। চিত্তরঞ্জনের পক্ষে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়া লর্ড সিংহ ব্যক্ত করেন যে, চিত্তরঞ্জন দেউলিয়া-দেনা শোধ করিবার জন্য প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে চাহিয়াছেন।

Justice Fletcher তখন মন্তব্য করেন—

I dont think we see it very frequently, Lord Sidha. It is not very often done.

কোন বন্ধুকে চিত্তরঞ্জন এই দেনা শোধের ব্যাপারের জন্য পাওনাদারদের সাথে কথাবার্তা চালাইতে বলেন।

তাঁহার বন্ধুই ইনসল্‌ভেন্সির composition যেমন হয়—শতকরা ২৫৲ টাকা দিয়া পাওনাদারদের সমস্ত করেন। বন্ধুই মহাখুসি হইয়া চিত্তরঞ্জনকে সংবাদ দেন যে পাওনাদারেরা শতকরা ২৫৲ টাকা পাইলেই খুসি হইবে—তুমিও ঋণমুক্ত হইবে। দেশবন্ধু বলিলেন—তুমি ভুল বুঝিয়াছ। আমি cent per cent অর্থাৎ একশ টাকায় ১০০৲ টাকা বা ষোল আনা টাকাই পরিশোধ করিতে চাই। পাওনাদারেরা যখন একথা শুনিল—তাঁহারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।

চিত্তরঞ্জন পাওনাদারদের ষোলআনা টাকা কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া নিজের ও পিতার দেউলিয়া নাম ঘুচাইলেন। তাঁহার পিতা সে সময় জীবিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতার নিকট চিত্তরঞ্জনের পিতা কিছু টাকা ধার করেন। তারপর দেউলিয়া হন। ১৮ বৎসর পর সুরেনবাবু একদিন সকালে উক্ত টাকা শোধের এক চেক দেশবন্ধুর নিকট হইতে পান, তার সাথে এক চিঠি।

সুরেনবাবু ঐ টাকা পাইয়া প্রথমে নির্বাক—পরে তাঁহার দুই চোখ হইতে অঝোরে জল পড়িতে লাগিল—আর সকলকে বলিতে লাগিলেন, "আমি ও চিত্ত একসঙ্গে মানুষ হইয়াছি, আজ চিত্ত আমাকে ছাড়াইয়া "দেবতা" হইয়া গেল, আর আমি "মানুষ" হইতেও পারিলাম না।"

সুভাষবাবু লিখিয়াছেন—চিত্তরঞ্জন জেলে থাকা কালীন তাঁহার শুশ্রূষা করিত (বেশীর ভাগ হাঁটু হইতে পা টিপিয়া দেওয়া) "বাধুর" নামে বন্দী—চোর নহে, ডাকাত। চিত্তরঞ্জনকে সে বাবা বলিয়া ডাকিত। দেশবন্ধুর সে এমন অনুরক্ত হইয়াছিল যে তিনি জেল হইতে খালাস হইবার সময় "বাধুর" তাঁহাকে কাঁদিয়া কাটিয়া ধরিয়াছিল, সে যখন খালাস পাইবে—সে বাবার ওখানে চাকুরি করিবে। দেশবন্ধু সেই প্রতিশ্রুতি দিয়া চলিয়া আসেন ও বাধুরের খালাস হইবার দিন বাড়ী হইতে লোক পাঠাইয়া নিজ বাড়ীতে (রসা রোডের) লইয়া আসেন। বাধুর 'বাবার' চাকর হইয়া রসা রোডের বাড়ীতে মহোল্লাসেই কাজ করিত—কাহাকেও মানিত না—এক বাবা ছাড়া। পুলিশ দাগী আসামীদের খোঁজ করিতে করিতে একবার বাধুরকে থানায় লইয়া যায়। দেশবন্ধু খাপ্পা হইয়া পুলিশ-কমিশনারের নিকট চিঠি লিখিয়া তাহাকে খালাস করিয়া আনেন।

সুভাষবাবু লিখিয়াছেন—সেই বাধুর দেশবন্ধুর অজ্ঞাতসারে রসারোডের বাড়ী হইতে রূপার বাসনপত্র লইয়া চলিয়া যায়। অথচ পুলিশে কোন খবর দেওয়া হয় না। জিন-ভালজিনের গল্পের পুনরাবৃত্তি নয় কি?

সুভাষবাবু আরো বলিয়াছেন—জেলে থাকা কালীন তিনি এটর্ণীর চিঠি পাইলেন, যে ২০ হাজার টাকা বাকেয়া

দিয়া ধার করিয়াছিলেন শতকরা ১০৲ টাকা সুদে খুব গোপনে বাড়ীর কাহাকেও না জানাইয়া, ঐ প্রোনোট তামাদি হইতেছে—অবিলম্বে নতুন প্রোনোট করিয়া দিতে হইবে। দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া হ্যাণ্ডনোট বদলাইয়া দিলেন।

আর একবার এক বন্ধুর জন্য বিশ হাজার টাকার জামিন হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন বন্ধু সে টাকা দিতে পারিবে না—তিনি সেই জামিনের টাকা দিয়ে দেন।

তা'ছাড়া কন্যাদায়ে সাহায্য, তাঁহার দেশ বিক্রমপুরের লোকেদের নানারকম সাহায্য, লাইব্রেরী স্কুল প্রভৃতি এবং অসংখ্য পরিবারদের নিয়মিত মাসিক সাহায্য যে কত দিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

যাতায়াতের সময় প্রতি কুলীকে একটাকা করিয়া দিতেন এবং ট্যাক্সি প্রভৃতির ভাড়া—শেয়ালদ' হইতে বাড়ি বা বাড়ি হইতে হাবড়া, ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন—ইহা আমাদের জানা ঘটনা।

'সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে বড় বলে,
মনের মাঝারে পূজে সর্বক্ষণ!'

ভোগে ও ত্যাগে চিত্তরঞ্জন

নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় বলিতেছেন—একদিন দেখি চিত্ত নীচে বিমর্ষ মনে কি ভাবিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাই, বসে আছ যে!"

চিত্ত—কি বলব, পেটের টান পড়েছে। আজ সংসারে তাক্ খরচের একটা টাকাও নাই। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—কাগজপত্র দেখিতেছে। আমি বলিলাম—কোথায় যেতে হবে—কত পাবে?

চিত্ত—রাজশাহী। মাত্র তিনশত টাকা!

আমি—এত কম কেন?

চিত্ত—আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি। এই তিনশত টাকাই আজ ভগবানের দান।

পরে বলিতেছেন—একদিন অপরাহ্নে তাঁহার বাড়ীতে কীর্ত্তন হইতেছে, হাইকোর্টের অনেক জজ, ব্যারিষ্টার, উকীল প্রভৃতি সমাসীন হইয়াছেন, পাশ্চাত্য শিক্ষিতা অনেক বিশিষ্টা মহিলাও সে গান শ্রবণ করিতেছেন। গান হইতে লাগিল—

"চলচল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।"

দেখিলাম—চিত্ত একেবারে ভাবোন্মত্ত, অবিরলধারায়

বক্ষ ভাসাইয়া নয়নাশ্রু বিগলিত হইতেছে। মনে হইল, যেন সেই অশ্রুধারা প্রস্রবণের ন্যায় অবাধিত ভাবে ভগবানের চরণ বিধৌত করিবার জন্য বিগলিত হইয়াছে।

চিত্তরঞ্জনের ভগবৎ-প্রেমের ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এই ভগবৎ-প্রেমই তাঁহাকে ত্যাগে ও ভোগের মধ্যে অপূর্ব সামঞ্জস্য করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

যাঁহার বাড়ির নিত্য বাজার খরচ ছিল একশত টাকা—সব রকম দিশী বিলাতী খাদ্য, ডিনার, উৎকৃষ্ট সুরা প্রভৃতিতে যিনি রোজ রসনা পরিতৃপ্ত করিতেন ও অন্যকে করাইতেন—সেই চিত্তরঞ্জন অসহযোগে যোগ দিবার পর সব ছাড়িয়া দেন—এমন কি চা পর্য্যন্ত। তামাক ও পাঁপর তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল—তিনি তাহাও ছাড়িয়া দেন।

এই শক্তি তিনি পাইলেন কোথায়?

ভগবানে আত্মসমর্পণ

গীতা আজিও ভারতবাসীর জীবন-বেদ। ভগবান—চিত্তরঞ্জনের "নারায়ণ", তাঁহার অন্তর্যামী "কিশোর কিশোরী"—স্থিতধীর লক্ষণ বলিতেছেন—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন এবং সুখের কোন স্পৃহা করেন না ও অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ রহিত তাঁহাকেই স্থিতধীঃ ও মুনি বলা হয়।

চিত্তরঞ্জন গীতার বর্ণিত স্থিতধী ছিলেন—এমন ত্যাগে ও ভোগে তিনি অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন।

সেই স্থিতধী—মুনি, কবি, তত্ত্বদর্শী পুরুষকে—যিনি মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন, আমরা বার বার নমস্কার করি।

ডাঃ হরেন্দ্র মুখার্জী

ডাঃ হরেন্দ্র মুখার্জী—বাংলার গভর্ণরের কথা না বলিলে দেশবন্ধুর কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চিত্তরঞ্জনের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি দার্জিলিঙের 'ষ্টেপ এসাইড' বাড়ীতে, যেখানে দেশবন্ধু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন,—'চিত্তরঞ্জন যক্ষ্মা-হাসপাতাল' নির্মাণের মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, ভিক্ষা করিয়া চাদা তুলিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

দেশবন্ধুর আদর্শ তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যতদিন বাংলার লাট ছিলেন তিনি ধুতি চাদর পরিতেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী ও ত্যাগী—তিনি দেশবন্ধুর স্মৃতিকে আরও সমুজ্জল করিয়া দিয়েছেন।

দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন—"তুমি হিন্দু হও, খৃষ্টান হও,—তুমি বাঙালী।" ডাঃ হরেন্দ্র মুখার্জী মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন। দীর্ঘদিন পার্লামেন্টের সভ্য ছিলেন তিনি, এবং ভারত-সংবিধানের খসড়া রচনা তাঁহারই।

আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্যর! (আমরা তাঁহারই ছাত্র ছিলাম) আপনার সাথে দেশবন্ধুর পরিচয় ছিল? তিনি বলিলেন—না। কেবল দেশবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মাত্র ৫০০৲ টাকা করিয়া মাহিনা লইতেন—বাংলার লাট থাকা সময়ে।

চিত্ত-কথা

[দেশবন্ধু-স্মৃতি]

সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স উপলক্ষ্যে দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। আমি সেই সময় সিরাজগঞ্জে হিন্দু-মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির চ্যায়ার-ম্যান-স্বরূপে দাশ মহাশয়কে আমন্ত্রণ করিতে তাঁহার বাসায় যাই। তিনি সবে মাত্র পৌঁছিয়াছেন, বহুতর লোক, আমি ভিড় ঠেলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হিন্দু সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি স্বাভাবিক স্মিত হাস্যে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং এই হিন্দুসভা উপলক্ষ্যে যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটিতে না পারে এ বিষয়ে আমাকে পুনঃপুনঃ বলিলেন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সিরাজগঞ্জে আগমন উপলক্ষ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের একদলের মধ্যে একটা বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে স্বামীজীর

সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য, এ্যাডভান্স পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অখিলবরণ রায়কে তিনি আমার সঙ্গে দিলেন। আমি দাশ মহাশয়ের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলাম না, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে এমন নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিলেন যে, আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলাম; কারণ ইহার পূর্ব্বে আমার সম্পাদিত 'জনসেবক' নামক পত্রে আমি তাঁহাকে শিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা জানিতেন।

দাশ মহাশয় বলিলেন,—শুদ্ধি আন্দোলন নিয়েই যত গোলযোগ। স্বামীজী পাঞ্জাব থেকে এসেছেন, সেখানে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। সে অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়েই চলেছে, কিন্তু বাঙলাদেশ মুসলমান-প্রধান, এখানে যদি এই শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ করা যায় তা হ'লে বিপদের আশঙ্কা খুব বেশী। এই কথা তিনি স্বামীজীকে বলিতে বলিলেন।

শ্রীযুক্ত অখিলবরণ রায়কে সঙ্গে লইয়া আমি স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দাশ মহাশয়ের কথা তাঁহাকে বলিলাম। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা হইল। কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইহার পরে অপরাহ্নে তিনটার সময় সম্মিলন মণ্ডপে দাশ মহাশয়ের সঙ্গে আমার দেখা। চারিটার সময় প্রাদেশিক সম্মিলন আরম্ভ হইল। ঐ দিন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতির অভিভাষণ পাঠ হইতে হইতে রাত আটটা বাজিয়া গেল। তাহার পরই হিন্দুসভার অধিবেশন হইবার কথা। আমরা দেরি দেখিয়া একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। দাশ মহাশয় বলিলেন,—দেশের কাজ করতে এসে এত চঞ্চল হলে চলে না, রাত তিনটে বেজে গেলেও হিন্দুসভার কাজ শেষ করে বাসায় যাবে।

প্রাদেশিক সভার বাকী কাজ শেষ করিয়া হিন্দুসভার কাজ আরম্ভ করিতে রাত নয়টা বাজিয়া গেল। প্রথমেই আমার অভিভাষণ পড়িবার পালা। আমি দাশ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার অভিভাষণ শেষ হইলে তিনি আমাকে জানাইলেন, আমার অভিভাষণ শুনিয়া তিনি খুব খুসী হইয়াছেন।

তাহার পর সভাপতি নির্ব্বাচন। হিন্দুসভার সভাপতি নির্ব্বাচন লইয়া একটু গোলযোগ হইল। সেই গোলযোগ মিটাইয়া সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে করিতে রাত এগারটা বাজিয়া গেল। সে দিনকার মত সভার কাজ শেষ করিয়া তিনি বাসায় গেলেন। সারাক্ষণ তাঁহার উৎসাহের একটুও হ্রাস দেখি নাই।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় প্রাদেশিক সম্মিলন আরম্ভ হইল। সেই দিনই 'প্যাক্ট' পাশ করিবার কথা। এই দিন তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলাম। Sense of invincibility ও strength of conviction-এর অপূর্ব সম্মিলন দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তিনি জানিতেন যে, বাঙলাদেশ মুসলমান-প্রধান, এখানে মুসলমানের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া বাঙালী জাতির গঠন হইতে পারে না এবং এই সত্যটি তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সে দৃশ্য এখনো আমি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। জ্যৈষ্ঠ মাস, অসহ্য গরম, প্রায় দশ হাজার লোক, বেলা চারিটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত সমভাবে একাসনে বসিয়া আছে! প্রতিপক্ষের অনলবর্ষী বক্তৃতার চোটে আমরা খাই-খাই হইয়াছি। সর্বশেষে পুরুষসিংহ তাঁহার Right-of-reply দিতে উঠিলেন। তখন সারা মণ্ডপ তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল বক্তৃতা দিয়া অধিকতম সদস্যের মত লইয়া তিনি 'প্যাক্ট' পাশ করিয়া লইলেন। মুখে জয়-গৌরবের বিপুল উল্লাস, তার সঙ্গে সত্য-রক্ষার পরম আত্মপ্রসাদের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে!

আমরা পায়ের ধুলা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করে এ সম্ভব হল?

তিনি স্মিতহাস্তে বলিয়া উঠিলেন, তোমরাও পারবে, যদি তোমাদের right ground কোথায় তা বুঝতে।

দুই কনফারেন্স ও হইয়া গেল। দ্বিতীয় দিন হিন্দু-সভার অধিবেশন বেলা একটা থেকে আরম্ভ হয়। ঐ দিন সকাল বেলা সভা-মণ্ডপের সম্মুখে একখানা গরুর ঠ্যাং পাওয়া যায়, ফলে হিন্দুদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অপর পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের একদল স্বেচ্ছাসেবক সকাল হইতেই লাঠি লইয়া দল বাঁধিয়া কুচ্ করিতে লাগিল—খুব high tension. শ্রদ্ধানন্দজীকে স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘিরিয়া সভায় লইয়া আসিল, দাশ মহাশয়ও আসিলেন। শ্রদ্ধানন্দজী পুরা একঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। অনেকেরই ভয় ছিল যে, স্বামীজীর বক্তৃতার ফলে এই সময় একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধের সূত্রপাত না হয়, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই প্রীত হইল।

এই সময় কলিকাতার পতিতা নারীদের পক্ষ হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল। টেলিগ্রামে হিন্দু-সভার সাফল্য কামনা করিয়া হিন্দুসভার আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই টেলিগ্রামখানা সভায় পড়া উচিত কিংবা ইহা লইয়া সভায় তুমুল তর্ক উপস্থিত হইল। শ্রদ্ধানন্দজী টেলিগ্রাম পড়িবার স্বপক্ষে মত দিলেন, দাশ মহাশয়ও তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন,

—তারা পতিতা বলে কি হিন্দুসভার উদ্দেশে সহানুভূতি জানাতে পারে না? তারা যখন হিন্দুসভার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে, তখন তাদের সে আশ্রয় দিতেই হবে। পরে আমাকে বলিলেন, পতিতাদের পক্ষ থেকে যে টেলিগ্রাম করেছে, কলকাতা গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে তারা কি চায় জানবে। এ কথায় সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে চাপা হাসির সাড়া পড়িয়া গেল ও ঠাট্টার গুঞ্জন শোনা গেল। আমি ভারী বিব্রত হইয়াই পড়িলাম। তিনি আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেশের কাজ করতে এসেছ, অন্যের উপহাসে তোমার কি এসে যায়!

তারকেশ্বর

সিরাজগঞ্জ হইতে ফিরিবার পথে আমি তিন দিন পাবনায় বিশ্রাম করি। কয়দিনের উদ্বেগে উত্তেজনায় আমি একটু অসুস্থ হইয়াই পড়িয়াছিলাম। কলিকাতা ফিরিয়া দাশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতেই তিনি বলিলেন, এ ক'দিন কোথায় ছিলে?

আমি পথে বিশ্রাম করার কথা বলিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, দেশের কাজে বিশ্রাম কোথায়? আমি তোমাদের চাইতে বুড়ো, এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ থেকে ফিরে তিনবার তারকেশ্বর গিয়েছি।

তখন তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহ পুরো দমে চলিতেছে, দলে দলে বাঙলার যুবকগণ জেলে যাইতেছে। এই সময় একদিন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গে সত্যাগ্রহ কমিটির মিটিং-এ তারকেশ্বর যাই। হাওড়া ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম, সঙ্গে ডাক্তার দাশগুপ্ত ছিলেন।

হাওড়া ছাড়িবার পর ডাক্তার দাশগুপ্ত আমার "বোলশেভিকবাদ" হইতে দুখানা ছবি তাঁহাকে দেখাইলেন। আমার বইখানি সবেমাত্র বাহির হইয়াছে, তাঁহার অনুমতি লইয়া সেখানা তাঁহার নামেই উৎসর্গ করা হইয়াছে। আমি বোলশেভিকবাদ সম্বন্ধে কথা

পারিলাম। বলিলাম, টাস্কেণ্ডে বোলশেভিকরা যেরূপ আড্ডা গাড়িয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষে তাহাদের আসিতে আর বড় দেরি হইবে না।

তিনি বলিলেন, টাস্কেণ্ড থেকে বোলশেভিকদের আসা নিয়ে আমি মোটেই ভাবি নে, আমি দেখছি, আমার সামনেই বোলশেভিক ব'সে আছে।

আমি বলিলাম, আপনি ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু তা না হয়ে আর উপায় কি? এই বলিয়া বোলশেভিকদের স্বপক্ষে বই-পড়া যত মামুলী মত—ধনিকের অত্যাচার, মূলধনের কেন্দ্রীভূত অবস্থা, শ্রমিকদের শোষণ, ধর্মের নামে লোক ঠকান, অভিজাত সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলাম। তিনি একটু হাসিলেন, তারপর একটু থেমে বলিলেন, ইউরোপের এই বোলশেভিকবাদ ভারতবর্ষে টিকবে না, কারণ তোমরা ভারতের সমাজের যে কি প্রাণ তা জান না, বাইরে থেকে যা আমদানি করতে চাইছ, তা এদেশের মাটিতে ফল ফলবে না, আগাছা হয়ে জঞ্জাল আরও বেশী বাড়িয়ে তুলবে। সমাজতন্ত্রই ভারতের প্রাণ। ভারত কোন দিন তার ভাইদের খেতে না দিয়ে নিজের পেট ভরাবার চেষ্টা করে নি। সকলকার মধ্যে সমানভাবে তার ধন-বিভাগ করে আসছে। ধনীর অর্থ চিরদিনই দরিদ্রের জন্যে উন্মুক্ত ছিল। অতিথি কখনো

বিমুখ হয়ে ফিরে যেত না। গ্রাম্য সমবায়ে সাধারণ পুষ্করিণী, দেবালয়, মন্দির, মসজিদ, পাঠশালা, টোল, মক্তব প্রভৃতি শিক্ষার কেন্দ্রগুলি গ্রামের সকলকার অর্থেই পুষ্ট হত, গ্রামের জমিদার এ-সব অর্থ সংগ্রহ করে যার যা প্রাপ্য দিতেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতই গ্রামের বিবাদ মেটাত। কথকতা, চণ্ডী, জারি, কীর্তন গানে লোক-শিক্ষার প্রভূত সাহায্য হত। আজ যদি তোমরা সে সব কাজের ভার খবরের কাগজের হাতে তুলে দাও এবং একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ফেলে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার গণ্ডিকেই শ্রেয় বলে মনে কর, তা হলে ভারতবর্ষের গলা টিপে মেরে ফেলা হবে। আমার স্বরাজের আদর্শ এই যে, সেখানে প্রত্যেকেই খেতে পাবে, কেউ না খেয়ে থাকবে না, কারুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে কিছুমাত্র বাধা থাকবে না। স্বাধীন অথচ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে সৌভ্রাত্রে ভারতের সমাজ আবার গড়ে উঠবে, সমগ্র দেশ সাধারণের ভূসম্পত্তি হবে। আর তুমি যে বললে, অর্থের কেন্দ্রীভূত অবস্থাটাই যত বিরোধের কারণ, বাহ্যত আজ তাই দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু আসলে এ দেশে অর্থ কোন দিনই কেন্দ্রীভূত হত না, কারণ ধন-বিভাগের ব্যবস্থা এতই সূক্ষ্ম ছিল যে, বাপ মরে গেলে তাঁর সঞ্চিত অর্থ সকল ছেলের মধ্যেই সমান অংশে ভাগ হয়ে যেত। এই ক্রমবিভাগের দ্বারাই সামঞ্জস্য রক্ষিত হত,

বণিকের প্রাধান্য কোন দিনই প্রবল হবার সুযোগ পেত না।

* * * *

কথা শুনিতে শুনিতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িলাম, পথে বহু জায়গায় গাড়ী থামিতেছিল, স্কুলের ছেলেরা ছুটি পাইয়া দলে দলে ফুলের মালা স্তবক ইত্যাদি লইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিতেছিল। ক্রমেই ভিড় বাড়িয়া চলিল। এই সময় একটা ষ্টেশন থেকে স্বামী সচ্চিদানন্দ উঠিলেন, তখন আমাদের কথা চাপা পড়িয়া গেল। তারকেশ্বর সম্বন্ধেই কথা চলিল। স্বামী সচ্চিদানন্দ তখনো আমাদের বিরোধী হইয়া উঠেন নাই; তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনিই তারকেশ্বরের মোহান্ত হইয়া গদিয়ান হইবেন। তখনো তাঁহার এই ইচ্ছায় কিছুমাত্র বাধা আসিয়া পড়ে নাই, সেইজন্য তিনি তখনো প্রাণপণেই আমাদের সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন।

আমরা যথাসময়ে তারকেশ্বর পৌঁছিলাম। নর-নারীর মুখে একটা সম্ভ্রমভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, অধর্ম্মের হাত হইতে ধর্ম্ম-মন্দিরের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে। এই কারণে দেশবন্ধুর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির আর সীমা ছিল না।

ষ্টেশন হইতে মন্দিরে পৌঁছিতে আমাদের আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। এতই লোকের ভিড়! সকলেই তাঁহার পায়ের ধুলা লইতে চায়।

সেখানে পৌঁছিয়া কমিটির মিটিং শেষ করিয়া তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলেন ও যথাযথ উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার ট্রেনে আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম।

ভম্বল (চিররঞ্জন) তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে কারাবরণ করিয়াছে। যখনই ভম্বল জেলে কেমন আছে, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই জবাব দিয়াছেন, বেশ ভাল আছে। অথচ জেলে ভম্বলের আমাশা হইয়াছিল ও খুব কষ্টে ছিল তাহা তিনি জানিতেন। এক দিনের জন্যও নিজ পুত্রের জন্য তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে দেখি নাই; বরং সত্যাগ্রহে ছেলে কারাবরণ করিয়াছে বলিয়া তাঁহার মুখে আমরা পরম আত্মপ্রসাদের ভাবই দেখিয়াছি।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি, সেদিন জন্মাষ্টমী। আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। শরৎবাবু তাঁহার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকিলেন, আমি বাহিরেই বসিলাম। শরৎবাবুর সহিত কথ-বার্তায় প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল। একবার তিনি বাহিরে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি বাইরে বসে কেন? কতক্ষণ এসেছ? ভেতরে এসো। ভেতরে গিয়া শরৎবাবুকে বলিলেন, শৈলেশকে বাইরে বসিয়ে রেখেছেন কেন? ঘরে আর কেউ নাই, আমরা তিনজন। বিপ্লববাদীদের

সম্বন্ধে কথা হইতে লাগিল। তিন আইনের বন্দীদের মধ্যে অনেকেরই নাম করিয়া তাঁহাদের মতামতের কথা বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, হিংসার পথে আমাদের কিছু হবে না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি অহিংসবাদ policy হিসাবে মানেন, না প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, অহিংসার দ্বারাই দেশ স্বাধীন হবে?

তিনি বলিলেন, তোমাদের বয়সে আমিও অহিংসা মানি নি। এখন সত্যই বিশ্বাস করি যে, অহিংসা ছাড়া আমাদের অন্য পথ নেই। যাহারা তিন আইনের বন্দী তাঁহাদের নাম করিয়া বলিলেন, এঁরা প্রত্যেকেই খুব বড় কর্মী, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য কত দুঃখ সয়েছেন। আজ যদি তাঁরা হিংসার পথ ত্যাগ করেন, এই পথে আসেন, তা হলে আমাদের কত কাজে জোর হয়, আমাদের বল দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

এই সময়ে টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আমি গিয়া টেলিফোন ধরিলাম—সাংঘাতিক খবর! নায়ক অফিস হইতে টেলিফোন করিয়াছে—আজ সন্ধ্যায় তারকেশ্বরে গুলি চলিয়াছে। আমি চীৎকার করিয়া সেই খবর বলিলাম, তিনি ও শরৎবাবু ঘরের বাহিরে আসিলেন। আমাকে বলিলেন, অত উত্তেজিত হয়ো না—টেলিফোনে সব কথা আগে ভাল করে

যায়। আমি ফোনে ভাল শুনতে পাইনে, তুমি স্থির হয়ে ফোন কর।

আবার ফোন করিলাম, সেই একই জবাব, বিস্তারিত কিছু বলিতে পারিল না। তাহা শুনিয়া তাঁহার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল, অস্থির ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই লালমোহন ঘোষ (পরে তিনি অন্তরীণে আবদ্ধ হন) দুইজন কংগ্রেসকর্ম্মীসহ আসিলেন। তাঁহারাও ঐ খবরই দিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে সব শুনিয়া তিনি খুব বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, নিরীহ ছেলেরা গুলি খেল, ধর্ম্মের স্থানে রক্তপাত হ'ল, আর বাকী কি?

রাত তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে, আমরা তাঁহাকে সেদিনকার মত বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, এত বড় সত্যাগ্রহ আমার হাতে, আমরা হেরে গেলে, বাঙলার মুখ থাকবে না। তার উপর এই সংবাদ, আমার বিশ্রাম কোথায়?

রাত একটা পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া তিনি যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা বলিয়া আমাদের বিদায় দিলেন। শরৎবাবুও তাঁহার সঙ্গেই আছেন, তিনিও তখন বিদায় লইলেন। তাঁহাকে বিদায় দিতে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আসিলেন, সিঁড়ির পার্শ্বে একটী আফিস

মনোহর কাল পাথরের শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ছিল। শরৎবাবুকে ঐ মূর্ত্তি সংগ্রহের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। ঐ মূর্ত্তিটি উড়িষ্যা হইতে তিনি সংগ্রহ করেন, বলিলেন, মূর্ত্তিটির বয়স পাঁচশত বৎসরের কম নহে। তাঁহার ইচ্ছা একটি মন্দির তৈয়ারি করিয়া এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

শরৎবাবুকে বলিলেন, আরো এক জোড়া রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি আছে, আপনাকে দিচ্ছি।

এই বলিয়া আবার উপরে উঠিয়া রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি শরৎবাবুকে দিয়া বলিলেন—আজ জন্মাষ্টমী, তাতে তারকেশ্বরে তুমি চলেছ, ঠাকুর স্বয়ং আজ আপনার ঘরে যাচ্ছেন। নন্দের বাড়ী ছেড়ে আজ গোকুলে যাচ্ছেন। হাসিয়া বলিলেন—

"তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

কলিকাতা

কলিকাতার ঘটনা অনেক। সব কথা বলা চলে না। মোটামুটি যাহা মনে আছে তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। তিনি কত বড় কবি ছিলেন, কত বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন, কত বড় রাজনৈতিক ছিলেন—সে সব কথা আমাপেক্ষা অনেক যোগ্যতর লোক বলিবেন। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়া তাঁহার মহান্ হৃদয়ের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বলিতে গিয়াই চোখ ঝাপসা হইয়া আসে, কলম চলে না! এত বড় দরদী আর কেহ ছিল না। লোকের দুঃখ কষ্ট নিজের প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন। অন্যের অভাবের কথা শুনিলে যেমন করিয়াই হোক তাহা মোচন করিতেন। প্রার্থী কখনও বিমুখ হইত না। আমাদের সাক্ষাতেই কত লোক মিথ্যা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা লইয়া যাইত। টাকা দেওয়ার পর বলিতেন—অমুকে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেল, ভেবেছে যে আমায় ঠকিয়েছে—তা নয়, আমি সব বুঝি।

কিন্তু এই খুব টাকা দেওয়ার আগে আসিত না। এই শহরের একখানা বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্র তাঁহাকে কিছুদিন খুব গালাগালি দিল। অথচ প্রেস-আইনের জন্য জামিন বাজেয়াপ্ত হইয়া কাগজখানি

যখন উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি নিজে দশহাজার টাকা জামিন হইয়া কাগজখানাকে বাঁচান। পরে আমরা এই কাগজের গালাগালি সম্বন্ধে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কাগজখানির বিরুদ্ধে লেখার কথা বলিতাম। তিনি হাসিয়া বলিতেন—তোমরা খামকা উত্তেজিত হও কেন? পরের ভাল করলে গালি খেতে হয়, এ ত জানা কথা।

অথচ একদিনও সেই কাগজের বিরুদ্ধে একটি রূঢ় কথা বলিতে শুনি নাই।

তখন তারকেশ্বর-সত্যাগ্রহ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার "নারায়ণ" যুগের কোন অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক বন্ধু একটি কার্য করিয়া বসেন। ঐ বন্ধুটির পানদোষ ছিল এবং উহা বাড়িয়াই চলিয়াছিল। বন্ধুটি প্রকৃতিস্থ হইলে অনলকে দিয়া তাহাকে বলিয়া পাঠান—ওকে বলিস যে, আমি তার জন্তে কেঁদেছি।

এই কথা শুনিবার পর ঐ বন্ধুটি আর মদ স্পর্শ করেন নাই।

তাঁহার অসহযোগ সময়ের জনৈক পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সহযোগী সম্বন্ধে কাগজে কলমে অনেক বিরুদ্ধ কথা উঠে এবং অনেক সময় তাহারই কথা আলোচনা হইত। অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিতেন,

তিনি কোন কথা বলিতেন না, চুপ করিয়া শুনিতেন। যখন নিন্দা অসহ্য হইত তখন তাহার জন্ত চোখের জল ফেলিতেন।

"ফরওয়ার্ড" পত্রের নাটক ও বায়োস্কোপ বিষয়ক স্তম্ভের প্রবন্ধ-লেখক একদিন অযথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে "ফরওয়ার্ড" কাগজে তাঁহাদের লেখা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া তীব্রভাবে লেখেন। আমি ঐ প্রবন্ধের জবাব লিখিয়া দাশ মহাশয়কে দেখাইতে যাই। তিনি বলিলেন, এক পক্ষের লেখা যখন ছেপেছে, তখন তোমার প্রতিবাদও ছাপা উচিত। সে ব্যবস্থা আমি করব। তবে তোমাদের বিবাদ কি নিয়ে?

আমি বলিলাম, প্রবন্ধ-লেখকের কথা এই, ইহা বস্তুতন্ত্রবাদী (Realistic) সাহিত্য, এ সাহিত্য সমাজের কলঙ্ক। আদর্শবাদী (Idealistic) বা didactic না হইলে সে সাহিত্যের কোন সার্থকতা নাই, ইহা লইয়াই যত বিবাদ।

তিনি বলিলেন—তোমাদের এ বিবাদ আমি দু'কথায় মিটিয়ে দিতে পারি। তোমরা অনর্থক একটা কাল্পনিক গণ্ডি সৃষ্টি ক'রে বিবাদ জটিল করে তুলেছ। বাস্তবিক পক্ষে সাহিত্যে realistic অথবা idealistic ব'লে কোন

কথা নেই। প্রেম-প্রীতি, দুঃখানুভূতি ও ত্যাগই হচ্ছে মূল কথা। যে সাহিত্যে তা আছে, তাই সৎসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা নরেশবাবুর লেখায় তা আছে—তাকে অশ্লীল বা কুৎসিত সাহিত্য বলা চলে না।

আমি বলিলাম, পতিতা নারীদের কথা ইহারা লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর চিঠিতে' স্বামীর সহিত মতের মিল না হওয়ায় স্ত্রী স্বামী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, শরৎবাবু বেশ্যা-চরিত্রে নারীদের মহিমা দেখাইয়াছেন, নরেশবাবু ভ্রষ্টা স্ত্রী সোনাকে ঘরে লওয়াইয়াছেন। ইহাতে এই সব ভুয়ো আদর্শবাদীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

তিনি বলিলেন—তোমার সাবিত্রীই হোক, কিরণই হোক আর সোনাই হোক, তারা যদি প্রেমাস্পদের জন্য দুঃখ পেয়ে থাকে, ত্যাগ ক'রে থাকে, তাহলে তাদের সৃষ্টি সার্থক হয়েছে।

পরে বলিলেন—আজকাল "রিয়েলিজম" নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখছি। এ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বামী-স্ত্রীতে দাঁড়ালে তা অচ্ছেদ্য হয়, এটা অনেক সময় পীড়াদায়ক স্বীকার করি; কিন্তু এ আদর্শ ভেঙে ফেলবার আগে তোমরা যা খাড়া করতে চাচ্ছ, তা টিকবে কিনা ভেবে দেখেছ কি?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন—Doll's

House খুব জোরের লেখা। আমরা প্রতিদিন দেখতে পাই, স্বামী-স্ত্রীতে মিল নেই, পরস্পরের মধ্যে প্রেম নেই, অথচ তারা ঘরকন্না করছে, একসঙ্গে বসবাস করছে। যদি সকলের বাড়ীই Doll's House হয় তাহলে আমাদের—স্বামী বেচারাদের—কি দশা হয়, সেটাও ত ভাববার বিষয়!

এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। পরে আবার বলিলেন—ইউরোপের আদর্শ তোমাদের মাথায় গিজগিজ করছে। তোমাদের ঘরের কোণে বৈষ্ণব-কবিদের যে অপূর্ব্ব প্রেমের আদর্শ আছে—সে সব ত তোমাদের নজরে পড়ে না। তাতে ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, জোলা, ন্যাট হামসুন—সব আছে। তোমাদের ইউরোপের কোন্ লেখক চণ্ডীদাসের মত সুদীর্ঘ বার বছর তার প্রণয়িনীর জন্তে একই জায়গায় রোজ ছিপ ফেলে বসে থাকত? তাঁদের কেউ কি বলতে পেরেছে—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে পর হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

রূপ-বর্ণনাই কি বৈষ্ণব-কবিদের সমান কেউ করতে পেরেছে? বলিয়া বলিলেন—

"চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

বৈষ্ণব-কবিদের অভিসার, মিলন, বিরহ, যা আছে, তোমার শত ইবসেন বা ইউরোপের সব লেখক একত্র হলেও তা বলতে পারবে না।

এই সময় আরও তিন চার জন লোক আসিয়া পড়িল, কাজেই তখনকার মত সাহিত্য আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

আমি যখন চলিয়া আসি তখন বলিলেন—এ সব লেখালেখি বন্ধ ক'রে দিতে আমি—কে ("ফরওয়ার্ড" পত্রের নাটক ও বায়োস্কোপ শীর্ষক স্তম্ভের প্রবন্ধলেখক) ব'লে দেব।

আর এক দিনের ঘটনা। তখন উত্তর-বঙ্গে গুণ্ডাদের হাতে হিন্দু-নারীর লাঞ্ছনার সংবাদ প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। আমরা খুব উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঐ সব ধর্ষিতা নারীরা নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় না পাইলে তাহাদের জন্য অবলা আশ্রম গোড়ের খুলিবেন।

উত্তর-বঙ্গের কোন জেলা হইতে ঐরূপ তিনটি ধর্ষিতা নারী নিরাশ্রয় হইয়া কলিকাতা আসিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা জানিবার জন্য তাঁহার

কাছে গিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, তিনি মোটরে উঠিয়াছেন, তখনই তারকেশ্বর যাইবেন। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কোন কথা আছে? আমি 'হাঁ' বলায় আমাকে মোটরে উঠিতে বলিলেন—সঙ্গে এসো। সঙ্গে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী ক্ষীরোদকুমার রায় আছেন।

গাড়ী রসা রোডে পড়িতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কথা?

আমি বলিলাম, তিনটি ধর্ষিতা নারী আনিয়াছে, তাহাদের কোথায় আশ্রয় দেওয়া যায়? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন, কেন, তাদের বাড়ীতে নিতে চায় না?

আমি বলিলাম, না।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কি জাত?

একটি ব্রাহ্মণ, আর দুটি নমশূদ্র।

—ব্রাহ্মণ মেয়েটির আশ্রয় হতে পারে। তবে নমশূদ্র মেয়ে দুটির আশ্রয় কোন আশ্রমে হবে না। এ নিয়ে আমি খুব চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন আশ্রমই রাজী হয় না।

এই বলিয়া তিনি আবার বলিলেন—পারবার যোগের মত আমি কত বিচার করব? এখানে ব্রাহ্মণের, ওখানে নমশূদ্রের। আবার যারা অন্য জাতির, তাদের যারা ধর্ষিতা হয়েছে, তাদেরও আবার এরা কেউ নিতে চায় না।

আশ্রম খুলে এদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাদেরও ত রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যাদের উপর অত্যাচার হবে তাদের যাতে ঘরে নেয় সে ব্যবস্থাই আগে দেখতে হবে। ঘরে আশ্রয় না পেলে, ওসব হতভাগিনীদের জন্ত কিছু কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই বলিয়া সত্যসত্যই তিনি চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। বলিলেন—এই দেশের অবস্থা!

আমি নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মোটর হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিল, কথা ঐখানেই বন্ধ হইল।

এবার স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্সের একটি কথার বিষয় বলিব। অল-ইণ্ডিয়া স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্স। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা আসিয়াছেন, বাগবাজারে পশুপতি বসু মহাশয়ের বাড়ীতে কন্‌ফারেন্স।

তখন গভর্ণরের ঢাকার উক্তি লইয়া দেশে মহা-উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে উঠিয়া অনেকে অনেক বলিলেন। শেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি মাত্র একটি কথা বলি। তিনি রিপোর্টারদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—শৈলেশের এ কথা তোমরা প্রকাশ করো না। পরে আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—তোমাকে সামলানো দায় হয়েছে, বক্তৃতা করে

জেলে যাওয়ার পক্ষে আমি নই, পার ত কাজ করে জেলে যাও।

স্বরাজ্য কন্‌ফারেন্সের পর সেপ্টেম্বরে তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির সময় জমিদার-পক্ষ সমর্থন করিয়া একজন পত্র-প্রেরক "ইংলিশম্যান," "ফরওয়ার্ড," "অমৃতবাজার" প্রভৃতি পত্রে স্বরাজ্যদলকে আক্রমণ করেন এবং এই বলিয়া কটাক্ষ করেন যে, স্বরাজ্যদল দাশ-নেহেরুর ঘোষণা উপেক্ষা করিয়া বোল্‌শেভিকদের পথে, আগাইয়া চলিয়াছে। আমি কাগজে প্রতিবাদ করি। পরে তিনি ফিরিয়া আসিলে ঐ লেখকের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আমার জবাব তাঁহাকে দেখাই। তিনি বলিলেন—আমরা আগে offensive নেব না, জমিদারদের শুধরোবার অবসর দেব। সেজন্য আমি কাউন্সিলে একটি কমিটি করেছি, বাইরেও "ল্যান্ড-হোল্ডার্স টেনেন্ট্‌স্ প্রোটেক্‌শন্ লীগ" নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করব। এ কমিটি বাঙলা দেশ ঘুরে জেলায় জেলায় গিয়ে কোন্ জমিদার কেমন, তার খোঁজ নিয়ে রিপোর্ট দিক। যে জমিদার অত্যাচারী, আমরা তাকে সাবধান হতে বলব। যদি না শোনে, তখন আপনার ভারে আপনা থেকেই তারা ভেঙে পড়বে। সে জন্য আগে থেকেই আমাদের offensive নেওয়ার দরকার কি? জমিদারদের পেছনে "ট্র্যাডিশন্" বলে কিছু আছে—তারা

যদি তাদের অতীতের আদর্শে ফিরে না যায় তাহলে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। তিনি All Bengal Tenants Protection Committee বলিয়া একটা কমিটিও গঠন করিয়াছিলেন। "অভিযান" আইনের গোলযোগহেতু তিনি এটিকে রীতিমত কাজে লাগাইতে পারেন নাই।

পূজার পরই বাঙলায় "অভিযান"-এর সূত্রপাত হইল—একাধিক জন বাছা বাছা কংগ্রেসকর্মী বিনাবিচারে কারারুদ্ধ হইলেন। সে দিনের ঘটনা আমার এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে। বড়বাজারে কালীপূজায় গোলমাল হইবে রটাইয়া দিয়া পুলিস অধিকাংশ লোকের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করে। আমরাও সেদিন এগারটা পর্য্যন্ত বড়বাজারে শান্তিরক্ষক স্বেচ্ছাসেবক গঠনে ব্যস্ত ছিলাম। বাসায় ফিরিতেই পথে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলাম। শুনিয়া বজ্রাহতের মত বসিয়া পড়িলাম। প্রথম আঘাতের চোট সামলাইয়া আমরা ৯ নং কলাবোত কংগ্রেস অফিসে গেলাম। সেখানে পুলিস বেলা দুইটা পর্য্যন্ত আমাদের প্রবেশ করিতে দিল না। পরে তাহারা চলিয়া গেলে, কংগ্রেস অফিসে ঢুকিয়া যাহারা তখন সেখানে উপস্থিত ছিল তাহাদের সঙ্গে প্রাণভরা আলিঙ্গনে পরস্পর আবদ্ধ হইলাম। সকলের মুখেই বিষাদ ও নিরুৎসাহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাণপ্রিয় সহকর্মীদের

ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এ সময় দেশবন্ধু উপস্থিত নাই, তিনি উপস্থিত থাকিলে একটা ব্যবস্থা হইতই। তাঁহার নিকট নানা দিক হইতে তার প্রেরণ করা হইল। তিন দিন পর তিনি কলিকাতা পৌঁছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া তিনি সিমলায় কুকুরের কাছে এক তাঁবুতে ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য এতই উৎসুক হইয়াছিলাম যে হাওড়া ছাড়িয়া লিলুয়ায় গেলাম। রেল-গাড়ী প্ল্যাটফরমে ঢুকিতেই আমরা লাফাইয়া তাঁহার গাড়িতে উঠিলাম। কুশল প্রশ্ন আর করা হইল না—প্রথম কথাই "অর্ডিনান্স" লইয়া।

আমরা বলিলাম, এ দিকে শুনুন, আপনাকে পথে ধরিবে। দিন দুই আরো অপেক্ষা করিয়া আসিলে হইত না কি?

তিনি বলিলেন—আমার ঘরে আগুন লেগেছে, আমার কি পালিয়ে থাকা চলে? তারা যেখানে ইচ্ছে হয় ধরুক, তাতে ভ্রুক্ষেপ করব না। এর একটা কিছু বিহিত করবই।

তাঁহার উপস্থিতিতে আমাদের প্রাণে বল ফিরিয়া আসিল, নিরুৎসাহের ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি আসিয়াই পরের দিন কর্পোরেশনে বজ্র-নির্ঘোষে Lawless Law বলিয়া গভর্নমেন্টকে যে challenge করিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। পরে তাঁহার সমস্ত শক্তি

এই "অর্ডিন্যান্স"-এর অত্যাচারের প্রতিবাদ করে, "ডায়ার্কি" ভাঙ্গিবার জন্ত কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন। তিন তিনবার কাউন্সিল জয় করিতে তাঁহার অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হইয়াছিল। বাকী যেটুকু ছিল তাহা স্বরাজ্য সপ্তাহেই শেষ করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য সপ্তাহের কথা মনে পড়ে। অনাহারে অস্নাত অবস্থায় বেলা ছইটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়াই আধঘণ্টার মধ্যেই স্নানাহার শেষ করিয়া আবার বাহির হইয়াছেন। যে লোকের চাকরে তেল না মাখাইলে স্নান হইত না, বহুবিধ ভোজ্যেও যাঁহার তৃপ্তি হইত না, তিনি কোন রকমে দুটি নাকেমুখে গুঁজিয়া খাওয়া সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া দ্বিতীয়বার যখন তাঁহার শূলবেদনা হয়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বদিন ছোলার ডাল খাইয়াছিলেন। তাহা হইতেই বেদনা-বৃদ্ধি। ছোলার ডাল তাঁহার পক্ষে কুপথ্য, ডাক্তারেরা খাইতে নিষেধ করিয়াছিল। উপরের হলঘরে সকলে সমবেত হইয়া তাঁহাকে তখন তাঁহার খাওয়া সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিল; তিনি হাসিয়া বলিলেন—আর বিশেষ কিছু ছিল না, ভাতগুলি ওঠাতে হবে ত, তাই ছোলার ডাল দিয়ে সে কাজটি সেরে ফেলেছি।

চিরজীবন জটা-কমণ্ডলুধারী অনেক সন্ন্যাসীর কথা

শোনা যায়, কিন্তু রাজর্ষি জনকের মত ভোগ ও ত্যাগের এই অপূর্ব্ব সমন্বয় আজকালকার দিনে কেহ দেখিয়াছে কি না জানি না।

পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার বড় জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর রায়ের বাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহার নিজ আবাস-ভবন তখন দান করিয়া দিয়াছেন, সেই কারণে সে-বাড়ীতে আর উঠেন নাই। সুধীরবাবুর বাড়ী হইতেই তৃতীয়বার মন্ত্রী-বেতন-প্রস্তাবে গভর্নমেণ্টকে হারাইয়া দেন। পরে ২ নং বিশপ লিফ্রয় রোডে বাড়ী ভাড়া করেন।

তখন শরীর খুব অসুস্থ, হাত কাঁপে, চলিতে পারেন না।

পাটনা হইতে ফিরিবার আগেই তাঁহার ১৪৮ নং রসা রোড ভবনে চুরি হইয়া যায়, রূপার বাসন-পত্র সবই চোরে লইয়া যায়।

তিনি জেল-ফেরত একটা দাগী চোরকে লইয়া আসেন ও তাহাকে চাকর করিয়া বাড়ীতে আশ্রয় দেন। যে ভাবে চুরি হইয়াছে, তাহাতে বাড়ীর লোকের যোগাযোগ না থাকিলে বাহির হইতে লোক আসিয়া চুরি করিতে পারে না। পাটনা যাইবার সময় চোর-চাকরকে বাড়ীর হেপাজত করিবার জন্য রাখিয়া যান। চুরির পরে সকলেই ঐ চোর-চাকরকে জেলে দিবার জন্য পীড়াপীড়ি

করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, ও পাজী চোর, ওর সহযোগেই চুরি হইয়াছে।

অনুমান যে অনেকটা সত্য, সে কথা তিনিও স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাহাকে জেলে দিলেন না। আমরা ঐ চাকরকে জেলে দিতে বলায় তিনি বলিয়াছিলেন—ওকে জেলে দিলে আর কি হবে? আমি ওকে বলতে ছিলাম, ব্যাটা কেঁদে বলল, জেলে গেলে সে দুটো খেতে পাবে বটে কিন্তু তার স্ত্রী-পুত্র না খেতে পেয়ে মারা যাবে। কি কাজ একটা সংসারকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলে?

দার্জিলিঙ যাইবার অব্যবহিত আগে তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রের জনৈক কর্মচারীকে পদচ্যুত করেন। পাঁচ সাতদিন পর ঐ কর্মচারীটি তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির। সে খাইতে না পাইয়া মারা যাইতেছে। অমনি সব রাগ জল হইয়া গেল। সে যে খাইতে পাইতেছে না, এ কথা সে আগে বলে নাই কেন—এই বলিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। পরে তাহাকে কাজে পুনরায় বাহাল করিয়া তাহার খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কেহ খাইতে পাইতেছে না, এ কথা শুনিলে তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না। যেমন করিয়াই হোক, তাহার অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন।

বেলগাঁও

"অর্ডিনান্স" আইনের প্রতিবাদ কল্পে মহাত্মাজী ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের নেতারা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময় informal conference-এ ইহা লইয়া বিতর্ক হয় যে, স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া হইবে কিনা। তখন এই বিতর্কের মীমাংসা হইল না। এই রকম একটা বিতণ্ডার ভাব লইয়াই বাঙলা দেশ হইতে আমরা সেখানে কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাই। দাশ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া না লইলে তিনি স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইবেন। তিনি কংগ্রেসের সদস্যদের চারি আনা চাঁদার পরিবর্তে সুতা কাটার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন, কাজেই মহাত্মাজীও স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরে এই দুইটি প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন করিলে সুতাকাটা-চাঁদার বিরুদ্ধে পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নেতারা ঘোরতর আপত্তি করেন। দাশ মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বাক্‌পটুতার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধ যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে মহাত্মাজীর ঐ প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন। স্বরাজ্যদল কংগ্রেসেরই অন্তর্ভুক্ত, এই প্রস্তাবটিও মানিয়া লইতে

কেহই আপত্তি করে নাই। এই দুইটি বিষয় ছাড়া এবারকার কংগ্রেসে আর কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল না।

এই কংগ্রেস উপলক্ষ্যে তাঁহার অপূর্ব ধৈর্য্য ও অনন্য-সাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি সকাল আটটার সময় বেলগাঁও-এ পৌঁছেন, অপরাহ্ণ দুইটা পর্য্যন্ত নিখিল-ভারত রাষ্ট্র-সভার বৈঠক চলিয়াছে। তাঁহার মুখখানি শুকনো দেখিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার এখনো খাওয়া হয় নাই?

তিনি হাসিয়া বলিলেন—আজ খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত ছিল না, তাই কুকার-এ রান্না চাপিয়ে এসেছি। গিয়ে খাব।

সেদিন বেলা চারিটার সময় সভার কার্য্য শেষ করিয়া আহার করেন। অথচ আমরা বেলা বারটার সময় পৌঁছিয়াই স্নান আহার শেষ করিয়া তবে বৈঠকে যোগদান করি।

বেলগাঁও-এ তাঁহার খাওয়ার খুব অসুবিধা হইয়াছিল। টিনের খাদ্য খাইয়া এখান হইতেই তাঁহার কাল-ব্যাধির সূত্রপাত হইল।

কংগ্রেস ত হইয়া গেল। এবার ফিরিবার পালা। আমরা এক সঙ্গেই রওনা হইলাম। পরদিন ভোর বেলা পুনা ষ্টেশনে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। দেখিলাম

সবেমাত্র উঠিয়া তিনি আর মতিলালজী চা পান করিতেছেন। আমি গিয়া বলিলাম—আমরা আজ পুনায় থাকিতে চাই। আপনি বোম্বে গিয়া দুদিন বিশ্রাম না করিয়া কখনই কলিকাতায় যাইবেন না। কারণ এ কয়দিনের অনিয়মে আপনার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

তিনি স্বাভাবিক হাসি হাসিয়া বলিলেন—তোমরা সব দেখে শুনে এসো। কিন্তু আমার যে বিশ্রামের সময় নেই—সাত দিন পর আমার কাউন্সিল। আমি আজই বোম্বে মেল ধরে কলকাতায় চলে যাব।

করিয়াছিলেনও তাই। বেলা দশটায় বোম্বে পৌঁছিয়া ঐ দিনই বিকালের ডাক-গাড়ীতে তিনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা আসিয়াই তিনি অম্লশূলে শয্যাগত হইয়া পড়েন, কিন্তু প্রাণে তাঁহার অদম্য স্বদেশপ্রেম তিনি ত আর সাধারণের মত রোগ-শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারেন না। তাই ষ্ট্রেচারে শুইয়াই তিনি কাউন্সিলে উপস্থিত হইলেন এবং তৃতীয়বার গভর্ণমেন্টকে মন্ত্রী-বেতন প্রস্তাবে হারাইয়া দেন।

দেশ-মাতৃকার আহ্বানে নিজের দৈহিক অসুস্থতাকেও তিনি কোন দিন একটুকু বিশ্রামের অবসর দেন নাই।

পাটনা

বেলগাঁও হইতে যে ব্যাধি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বসিল, তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইতে অনেক দিন লাগিল। এই সময় ডাক্তারদের পরামর্শে বায়ুপরিবর্তন ও বিশ্রামের জন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পাটনার বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ের কাছে পাটনা যাওয়া স্থির হইল। সে সময় তিনি আমাকে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিবার ভার দিয়াছিলেন। তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আমাকে প্রায় প্রতি দিনই ডাকাইয়া কাগজ বাহির করার সম্বন্ধে declaration লওয়ার কি হইল, তাহার কি নাম ঠিক করিয়াছি, তাহার সুর কিরূপ হইল ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। এবং যে-দিন পাটনা চলিয়া গেলেন সে-দিন বিকালে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে বলিলেন,—আমি ত চল্লুম, ইতিমধ্যে তুমি কাগজখানা বার ক'রে আমায় সেখানে পাঠিয়ে দেবে। আর দেরী করা নয়, শীগগির যাতে বার করতে পার তার ব্যবস্থা করে ফেল।

ইহারই কয়েক দিন বাদে কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমি পাটনা যাই। পাটনাতে যাইয়া আমি ডাক-বাঙলাতে উঠি। পৌঁছিয়াই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি মঞ্জিল-এ উপস্থিত

হই। গিয়া দেখিলাম দুই ভাই পরম উৎসাহে কীর্ত্তন শুনিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—এখন ত কীর্ত্তন হচ্ছে, তুমি একটু ঘুরে এসো।

এগারটার সময় পুনরায় গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন এলে? কোথায় উঠেছ?

আমি সকালে পৌঁছিয়া ডাকবাংলাতে উঠিয়াছি বলায় তিনি ভারী দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে বলিলেন, ভারী ক্লান্ত হয়েছি। বিকালে এসো, তখন কথাবার্ত্তা হবে।

বিকালে আমি যথাসময়ে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম। তখনও তাঁহার শরীর অসুস্থ, হাত কাঁপে, ভারী দুর্ব্বল, চলিতে পা কাঁপে। কাজের কথা পাড়িতে আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—রোগ ত আমার এখন চিরসাথী, তার জন্যে কাজ ত আটকা রাখলে চলবে না। যতক্ষণ বেঁচে আছি, কাজ করতেই হবে।

এই বলিয়া আমাকে কাজের বিষয়ে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় দিলেন। কেননা ঐ দিনই রাত্রিতে আবার স্বরাজ্যদলের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন সম্পাদন করিতে হইবে। দৈহিক পীড়া তাঁহার কর্ম্ম-নিষ্ঠাকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারে নাই।

ফরিদপুর

ফরিদপুর কনফারেন্স এক-হিসাবে যুগ-প্রবর্ত্তক

(Epoch-making), ইহা লইয়া চারিদিকে খুব হৈ-চৈ গণ্ডগোল হইতেছে। কেহ বলেন, দাশ মহাশয় গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করিতে চাহিয়াছেন; কেহ বা বলেন, এই কনফারেন্স তাঁহার পরাজয়ের নিদর্শন; আর কেহ বা বলেন, ইহা তাঁহার বিজয় দুন্দুভি। আমি তর্ক-বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া এই কনফারেন্স উপলক্ষ্যে ভিতরের মানুষটির যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাই বলিব।

তিনি পাটনা থাকিতেই বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির সভায় তাঁহাকে এক বাক্যে ফরিদপুর কনফারেন্সের সভাপতিপদে বরণ করা হয়। প্রথম তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তাঁহার অসুস্থতার জন্য ছইবার অধিবেশনের তারিখ বদলাইতে হয়।

কনফারেন্সের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা আসেন। বাহির হইতে দেখিতে খুব রোগা দেখাইত না, কিন্তু জামা খুলিলেই তাঁহার কঙ্কালসার চেহারা নজরে পড়িত। কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে তিনি জামা খুলিয়া দেখাইলেন। আমরা তাঁহার দেহের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সেই সভাতেই কনফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে, তাহার একটা খসড়া তিনি উপস্থিত করেন এবং এই সময়েই তাঁহার ফরিদপুর-অভিভাষণ আমরা দেখিতে পাই। অভিভাষণ লইয়া কোন আলোচনা করাই হয় না, তবে প্রস্তাবের খসড়া

লইয়া একটু আলোচনা হয়। কমিটির বেশীর ভাগ সভ্যের মতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইবে না তাহা তিনি বাদ দিবেন, এই কথা বলার পর সে-দিনকার কমিটির অধিবেশন ভঙ্গ হয়।

এইবার ফরিদপুর যাত্রার কথা। এক ট্রেণেই আমরা তাঁহার সঙ্গে ফরিদপুর রওনা হইলাম। তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল বলিয়া পথে কোন রকম হৈ-চৈ না হয় সে-সম্বন্ধে নিষেধ ছিল। শেষ রাত্রিতে আমরা রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখনও রাত্রি আছে। সেখানে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দাশ মহাশয়ের ঘুমের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া নীরবেই চা-বিস্কুট দিয়া আমাদের অভ্যর্থনার কাজ শেষ করিলেন।

যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। বেলা আটটার সময় ফরিদপুর পৌঁছিলাম। মাঝের ষ্টেশনে খবর পাওয়া গেল, দাশ মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, তিনি বেঞ্চির উপর বসিয়া গল্প করিতেছেন। তিনি সুস্থ আছেন, রাত্রিতে সুনিদ্রা হইয়াছে জানিয়া আমরা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম।

ফরিদপুর নামিবার পরও যাহাতে বেশী গোলমাল না হয় সে ব্যবস্থা ছিল। তিনি ট্রেণ হইতে নামিয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিহে, ট্রেণে ত তোমাদের কোন অসুবিধা হয় নি? ঘুমোতে পেরেছিলে ত?

পরে সুরেন বাবুকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— এদের থাকবার জায়গার সুবন্দোবস্ত হয়েছে ত? এই বলিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন, আমরা সকলে তাঁহার অনুসরণ করিলাম।

আমরা বৈকালে তাঁহার বাঙলায় যাইয়া দেখিলাম, সারা বাড়ীতে শহরের যত নারী-পুরুষ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তিনি স্মিত হাস্যে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতেছেন! পরের দিন মহাত্মাজী আসিবেন, তাঁহার অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত ও কনফারেন্সে যে-সকল প্রস্তাব গৃহীত হইবে তাহারই আলোচনা চলিতে লাগিল।

ইহার পরেই ঠাকুর জগবন্ধুর সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হইল। অদূরেই ঠাকুরের আশ্রম। তিনি বলিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার দুইবার দেখা হইয়াছিল। তিনি যে বাড়ীতে আছেন তাহারই উঠানে পঞ্চবটী আছে, সেখানে ঠাকুর আসিয়া বসিতেন, বলিলেন। জুতো পায়ে পঞ্চবটী তলায় যাইতে আমাদের নিষেধ করিলেন। রাত্রি আটটা পর্যন্ত নানা রকম কথা-বার্তায় কাটাইয়া আমরা সে-দিনকার মত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

পরদিন কনফারেন্স। সকালেই শুনিলাম মহাত্মাজী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শহরময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দুটোর সময় কনফারেন্স বসিবার কথা, আমরা একটার সময় যাইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। মণ্ডপ

জনাকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিলধারণের স্থান নাই। এবং দাশ মহাশয় সভাপতি, মহাত্মাজী দর্শক, ফরিদপুরের শ্রোতাগণের সীমা নাই।

দাশ মহাশয় তিনটার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মহাত্মাজী তারই ঘণ্টাখানেক মধ্যে আসিলেন। বিপুল জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র নর-নারী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিল। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পঠিত হইবার পর দাশ-মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিলেন। স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে ওজস্বিনী ভাষায় তিনি তাঁহার অভিভাষণটি পাঠ করিলেন, শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘণ্টাদেড়েক সে অভিভাষণ শ্রবণ করিল। সে-দিনকার মত এইখানেই সভার কার্য্য শেষ হইল।

রাত্রি আটটার সময় "সাবজেক্ট কমিটির" অধিবেশন। পরদিনের অধিবেশনের জন্ত প্রস্তাবের খসড়া উপস্থিত করা হইল। একটি প্রস্তাবে, পঁচিশে অক্টোবর বে-আইনী আইনের (অর্ডিন্যান্স) জুলুমে যে সকল কংগ্রেস-কর্ম্মীকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদের নির্দ্দোষী বলা হয়। কিন্তু পঁচিশে অক্টোবরের আগে ও পরে তিন আইন ও অর্ডিন্যান্সে যে সকল সহকর্ম্মীদের বন্দী করা হইয়াছে তাঁহাদের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে সে প্রস্তাবে কোন উল্লেখ ছিল না। কেবল পঁচিশে অক্টোবরের বন্দীদের

নির্দ্দোষিতার কথাই বলা হইয়াছিল, ইহা লইয়াই মতভেদ উপস্থিত হয়।

এই মতভেদ শেষ পর্য্যন্ত মনান্তরে পৌঁছিবার উপক্রম হয়। কারণ তরুণের দল এভাবে তাঁহাদের প্রাণপ্রিয় সহকর্মীদের নির্দ্দোষিতার উল্লেখ না দেখিয়া ভারী মর্মাহত হইলেন, অথচ লর্ড রেডিং ও লর্ড লিটন যাহাদের উচ্চকণ্ঠে দোষী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই জবাবে দেশবন্ধু কেবলমাত্র তাঁহাদের নির্দ্দোষিতাই প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনেক বাগবিতণ্ডা হইল কিন্তু সেদিন রাত্রিতে আর সে সম্বন্ধে কোন মীমাংসাই হইল না। এই ঘটনাতেই তাঁহার অন্তরের অপ্রতিহত তেজস্বিতা সকলের সম্মুখে প্রজ্বলিত হুতাশনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণের কথাও তরুণের দল বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আর তরুণদলের প্রাণের মর্ম্মন্তুদ বেদনাও তাঁহারা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। সেদিন ওইখানেই বৈঠকের কাজ স্থগিত রহিল।

পরদিন সকালে তরুণের দল তাঁহার নিকট যাইয়া নিজেদের মনের ব্যথা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার মনে কোন রকম আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের কখনই ছিল না জানাইলেন। তাঁহার নেতৃত্বে তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস, কেবল নেতৃত্বে নয়, তাঁহাদের হৃদয়ের উপর তাঁহার অপরিসীম আধিপত্যের এতটুকুও হ্রাস হয় নাই। সব

কথা শুনিবার পর অর্ডিন্যান্স ও তিন আইনের বন্দীদের নির্দোষিতার প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। বাঙলার রাজনীতির আকাশে যে মেঘটুকু দেখা দিয়াছিল জনগণের প্রাণের হিল্লোলে তাহা কাটিয়া গেল। তাঁহার স্বাভাবিক স্মিতহাস্যে আবার সকলে অভিনন্দিত হইল। তাঁহার মুখের হাসি দেখিয়া সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

এই রকমে মহা আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ফরিদপুর-অধিবেশন শেষ হয়। এই অধিবেশনের রাজনৈতিক গুরুত্ব খুব বেশী। কারণ তিনি গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করিতে চাহিয়াছেন, এই অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা রটাইয়াছে। এ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব তাঁহার সহিত দার্জিলিঙ-এ "শেষ সাক্ষাৎ" ব্যক্ত করিয়াছি।

একই সঙ্গে আমরা তাঁহার সহিত ফরিদপুর হইতে রওনা হই। তিনি ফরিদপুরে একদিন অসুস্থ হইয়া পড়েন। গাড়ীতে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। তিনি গাড়ীতে উৎফুল্ল ভাবে আমাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, একটু ভাল আছেন। কলিকাতা গিয়াই দার্জিলিঙ যাইবেন। সেখানে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিবেন। তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিয়া মনের আনন্দে গাড়ী ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমরা প্রণাম করিয়া বিদায় লই।

শেষ সাক্ষাৎ

জুন মাসের প্রথম দিকে আমি দার্জিলিঙ যাই। সে-দিন ডাকগাড়ী নির্দিষ্ট সময়ের ঢের পরে যাইয়া দার্জিলিঙ পৌঁছিল। সে-দিন আর 'স্টেপ-এসাইডে' যাওয়া হইল না। পরের দিন পাঁচটার সময় দেশবন্ধুর কাছে যাই। যাইতেই পথে চৌরাস্তায় শ্রীমতী এনি বেসান্তের সাথে দেখা। তিনি দাশ মহাশয়ের বাড়ী খুঁজিতেছিলেন। একেবারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই গিয়া হাজির হইলাম। দেশবন্ধু তখন বাহিরে বেড়াইতে যাইবার জন্ত রিক্সতে উঠিতেছিলেন, আর বাহিরে যাওয়া হইল না। আমাদের সঙ্গে লইয়া গিয়া বারান্দায় বসিলেন। বলিলেন, তুমিও বসো।

মিসেস বেসান্ত মৃদুস্বরে বলিলেন,—I have got something private. তাহা শুনিয়া দেশবন্ধু একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন, কারণ যখনই অল-ইণ্ডিয়া লিডার বা বাহিরের কেহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তিনি আমাদের বাদ দিতেন না, সামনে থাকিলে ডাকিয়া লইতেন।

—তাতে কি? এই বলিয়া আমি মিসেস বেসান্তের পার্শ্বচর শিবরাওকে সঙ্গে লইয়া পাশের ঘরে ঢুকিলাম।

মিসেস বেসান্তের সঙ্গে তাঁহার যে কথা হইল তাহা

আমাদের শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিতে লাগিলেন, আমাদের কোন কথাই অজ্ঞাত রহিল না। তিনি আসিয়াছেন, তাঁহার Commonw ealth of India Bill সম্বন্ধে দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করিতে ও তাঁহার মতামত জানিতে। এক ঘন্টার উপর তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিল। যখন মিসেস বেসান্ত উঠিলেন, আমায় ডাকিলেন। আমি ছড়ি এবং টুপি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন,—চল, এখন বেরোন যাক।

বিষ্ণু পিছনে পিছনে চলিল। তিনি মাঝখানে, আমি ও স্বাস্থ্য (ছোট জামাই) দুই পার্শ্বে চলিলাম। "ষ্টেপ-এসাইড" হইতে লিবং রোড দিয়া ম্যালে উঠিতে হয়। ঐ-টুকু পথ কেবল কুশলপ্রশ্ন ও আমাদের কে কেমন আছে তাহা খুঁটিনাটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। শরীর ভাল হইতেছে বলিলেন, চেহারাও বেশ লালিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে দেখিলাম—যেন পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। হাসি ঠাট্টা ও কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে আমরা 'ম্যালে' আসিয়া পৌঁছিলাম। নবাব নবাবজাদি হইতে আরম্ভ করিয়া রাস্তার লোকজন, আর্দালী, চাপরাসী, কুলিরা পর্য্যন্ত দুই ধারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিল। অসংখ্য পরিচিত অপরিচিত নর-নারীর স্মিত অভিবাদন ও কুশল প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। আমরা ম্যাকেঞ্জি রোড দিয়া

সারা চলিলাম। পথে প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তি ও দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা দিতে লাগিলেন।

পথে ডান দিকে কতকগুলি লাল করগেটের ছাত-ওয়া এক-প্যাটার্নের বাড়ী দেখাইয়া আমাদের বলিলেন, এইগুলি একজন 'জার্মেনের' ছিল, গেল যুদ্ধের সময় সরকার বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে।

ক্রমে আমরা জনবিরল কাটা-পাহাড়ের পথ ধরিলাম। আমি তখন হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তাঁহার সাথে সমানে তাল রাখিতে পারিতেছি না, তাহা দেখিয়া বলিলেন,—তুমি আমার এখানে দিন সাতেক থাকলে তোমার ভুঁড়ি কমে যাবে। আমি এখানে এসে প্রথম প্রথম আট দশ মাইল হেঁটেছি—এখনো চার মাইলের কম হাঁটি নে।

এইবার রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, দেখ, মিসেস বেসান্ত-এর 'বিলের' সঙ্গে আমার সব বিষয়েই মিল আছে, কেবল উনি 'সিবিল ডিস্-ওবিডিয়েন্স' মানতে চান না, তা নিয়েই ত বড় গোল। 'সিবিল ডিস্-ওবিডিয়েন্স' আমাদের লক্ষ্য না থাকলে গবর্ণমেন্ট কেবল মুখের কথা শুনবে না। আমি আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত (লর্ড রেডিং না ফেরা পর্য্যন্ত) দেখব, পরে সারা বাঙলা দেশ ঘুরে 'সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স'-এর জন্যে তৈরী করব। আমি বেসান্তকে বলেছি, তোমরা অন্যান্য

কিন্তু-এ সই কর, নইলে 'অল-পার্টিস কন্‌ফারেন্স' কি হবে? তার উত্তরে বিপিন বোসার বলেছেন, শাস্ত্রী (শ্রীনিবাস শাস্ত্রী) ও সপ্রুকে (স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু) না জিজ্ঞাসা করে কিছু বলতে পারবেন না।—বল্লেন, ওঁদের সাহস নেই, ওঁরা 'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স'-এর নামে ভয় পান।

এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—আমার ফরিদপুর অভিভাষণ নিয়ে আমি 'মডারেট' বলে খুব হৈ চৈ হচ্ছে, কিন্তু আমি যা বলেছি, তা কেউ বোঝে নি। আমি সহযোগ করতে চাই নি। যদি গবর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে, কাজে দেখায়, তবে আমি সাময়িক* truce করতে রাজী আছি। অভিভাষণেও আমি এই কথাই বলেছি। এই কথাই তোমরা বিশেষ ক'রে বল সকলকে, আমি সহযোগ করতে চাইছি, এগুলি আমার কথার distortion.

আর সে আগষ্ট মাস আসিল না।

পরে বলিলেন, দু' মাস এখানে থাকলেই আমি ভালরূপ সেরে উঠব। কিন্তু আমার ত কিছুই নেই, একরকম পরগৃহ হবে (তিনি তখন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের অতিথি) কত দিন থাকি? এখানে একটা বাড়ী না নিলেই চলবে না।—বই-টই লিখে চালাব।

যিনি দেশের জন্ত সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছেন, রাজার ঐশ্বর্য্য দুই হাতে বিলাইয়াছেন, শেষজীবনে তাঁহাকে টাকার কথাও ভাবিতে হইয়াছে! কথাটা আমার প্রাণে তীরের মত বিঁধিল। আমি অনেকক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রশ্নে আমার চমক ভাঙিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—শিলিগুড়ি কেন যাচ্ছ?

আমি বলিলাম, মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে।

তিনি উচ্চ হাস্ত করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—তোমার মেয়ের বিয়ে! বয়স কত?

আমি বলিলাম, চোদ্দয় পড়েছে।

তিনি বলিলেন,—এই তোমাদের সমাজ-সংস্কার! এই তোমার বোলশেভিকবাদ লেখা! তোমরা মনে মুখে এক নও। যা ভাব, তা করতে ভয় পাও।

আমি, বাড়ীর জেদ, মায়ের পীড়াপীড়ি, ভাল বর হাত-ছাড়া হইয়া যায়—এ সব কৈফিয়ৎ দিলাম।

তিনি বলিলেন, এ সব ত মামুলি জবাব। যদি বুকে বাক থাকে, বাল্যবিবাহ দোষের, হাজার পীড়াপীড়িতেও তা দিতে পারবে না। ভাল বর সকল সময়েই পাওয়া যায়। যদি বামুনের মধ্যে না পাও, অন্ত জাতের মধ্যে পাবে। অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি? এই বলিয়া নিজের ও নিজের ছেলে-মেয়েদের বিবাহের দৃষ্টান্ত দিলেন।

তিনি বলিলেন—আমি যদি তিন শ' sincere বাঙালী

জেনে পাই, তবে দেশ-উদ্ধার, সমাজ-সংস্কার—সব কিছুই করতে পারি। তোমরা কাজ করবার আগে ভাব, কাজের ফলাফল বিবেচনা কর; কিন্তু আমি তা কখনো করি নি। ফলাফল না ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমি কখনো আগু-পিছু ভেবে কাজ করি নে। এই বলিয়া তিনি তাঁহার রাজনৈতিক ও ব্যারিষ্টারী জীবনের কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—আমি ছিলেম কবি, হলেম ব্যারিষ্টার। তোমরা সকলে জান আমি বড় ব্যারিষ্টার, খুব আইন জানি। সে সব কিছুই নয়। 'ব্রিফ' পেয়েই আগে তোমরা আইনের পাতা ওল্টাতে থাক, আমি সর্ব্বপ্রথমে আগাগোড়া 'ব্রিফ'খানা পড়তাম। একবার বারবার পড়তাম, পড়তে পড়তে তার weak point চোখের সামনে জেগে উঠত। তারই উপর আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতাম। এই বলিয়া তিনি মুসলমান পাড়া বোমার মামলার দৃষ্টান্ত দিলেন। পরে বলিলেন,—জুনিয়র অবস্থাটা বড় কষ্টকর, সিনিয়রদের snubbing খেতে হয়। তার উল্টো জবাব দিলেই মুখ বন্ধ।

এই সময় আমরা 'Glenaden' ছাড়াইয়াছি। তিনি বলিলেন,—আমরা 'West Point' পর্য্যন্ত যাব। ঐ দেখ, দিঘাপতিয়ার বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সামনেই 'Recluse.'

তখন কুয়াশা নীচে নামিয়াছে, আমরা তাঁহার পায়ের ওপর কোটটা জড়াইয়া দিলেম। আমাদের অনুরোধে তিনি বিস্ময়ে চাহিলেন, আমি 'রাগ্' দিয়া তাঁহার 'পা-দু' খানি ঢাকিয়া দিলাম।

বিদ্যুতের আলো কুয়াশাকে দূর করিতে না পারিয়া অন্ধকারকে আরো গাঢ় করিয়া তুলিয়াছে। নিস্তব্ধ শান্ত বনানীর স্তব্ধ মৌনতা ভেদ করিয়া আমরা চলিলাম। তিনি বলিলেন, দার্জিলিঙের সবুজতায় চোখ জুড়ায়, হিমে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা West Point-এ আসিয়া পড়িলাম। তাঁহার ইচ্ছা, তিনি কাটা-পাহাড়ে উঠেন। আমি আর উঠিতে পারিব না বলায় সেখানে হইতেই ফিরিতে মনস্থ করিলেন।

রাস্তার দুই পার্শ্বে আমরা দুজন চলিতেছি, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন,—দেখ, পলিটিক্সে surprise করতে হয়। আমি সব কাজেই surprise করেছি। আসছে মাস পর্যন্ত আমি চুপ করেই থাকব। পরে সবাই দেখবে যে, আমি মরেছি, না আর কিছু।

ফিরিবার মুখে পথ একেবারে নির্জন নহে, বেলা ভুলো-ফেরতা অসংখ্য ইউরোপীয় ইউরেশীয় বালক-বালিকারা দলে দলে বনানীর নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া হাস

মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতেছে। আমি বলিলাম, আমি আর বাড়িতে 'ট্রেণ এলাইডে' যাইব না, ষ্টেশন হইতেই ফিরিব। কিন্তু পথ চিনি না বলায় তিনি হাসিয়া বলিলেন,—ঠিক জায়গায় তোমায় ব'লে দেব।

পথে দুটি যুবকের সঙ্গে দেখা, তাঁহাদের তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছাগলের জোগাড় হয়েছে কি না?—কারণ দু'দিন পরেই মহাত্মাজী তাঁহার কাছে আসিবেন। ছেলে দুটি বলিলেন যে, একটি মাত্র জোগাড় হইয়াছে, আর হয় নাই। তখন তিনি আমাকে বলিলেন,—কাল ত তুমি শিলিগুড়ি যাচ্ছ, সেখান থেকে সোজা জলপাইগুড়ি যাবে, সেখানে গিয়ে তোমায় ছাগল জোগাড় ক'রে পাঠাতে হবে।

এর পরেই আমি সে-দিনকার মত বিদায় লইলাম। আমায় বলিলেন,—কাল সকাল নয়টায় অবশ্য এসো, মিসেস বেসান্তের কাছে আমায় নিয়ে যেতে হবে।

পরের দিন সকাল নয়টায় 'ষ্টেপ এসাইডে' পৌঁছিলাম, তখন তিনি ভিতরে চা খাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, একটু ব'স। চা-পান করিয়া বাহিরে আসিলেন। সামনে অনেকগুলি খবরের কাগজ পড়িয়া ছিল। মাদ্রাজ হইতে জনৈক মডারেট স্বরাজ্য-নীতি সমর্থন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। পরে বলিলেন, দেখবে আজ যাঁরা আমাদের বিরোধী তাঁরা আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের সাথে যোগ দিবেন।

এই সময় আমার সহযোগে সম্পাদিত "বাঙলা" সাপ্তাহিক পত্রখানার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে বলিলেন, ব্যক্তিগত আক্রমণ না ক'রে humourously যদি তোমরা লেখ, অনেক কাজ হবে।

এই সময় তাঁহার রিক্স আসিয়া পৌঁছিল, তিনি বাহিরে যাইবার জন্ত জামা-কাপড় পরিয়া আসিলেন। আমরা বাহির হইতেছি, এমন সময় নাটোরের কুমার ও তাঁহার সেক্রেটারী চারুবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভিড় পিছন পিছন চলিতে লাগিল। তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে চলিলেন। চৌরাস্তা হইতে কুমার বাহাদুর বিদায় লইলেন। আমি আর চারুবাবু তাঁহার সঙ্গে চলিলাম।

স্যানিটারিয়ামে ডাক্তার শিশিরবাবুর ওখানে মিসেস বেসান্ত উঠিয়াছেন। আমরা সেখানে চলিলাম। চৌরাস্তা হইতে সোজা পথ ধরিলাম। মিসেস বেসান্ত ও তাঁহার বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন। বলিলেন,—দেখো, শীঘ্রই সপ্রু-শাস্ত্রী আমাদের দলে আসবেন। Village organisation-এ দেরী হইতেছে বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং এই কাজটি যাহাতে শীঘ্র আরম্ভ হয় সে জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়দের বলিতে বলিলেন, আর দেরী করা সঙ্গত নয়। ইতিমধ্যে আমরা স্যানি-টারিয়ামে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে প্রথমেই ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা, তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি এখানে কবে এসেছেন? আপনি না Recluse-এ ছিলেন?

ইতিমধ্যে শিশিরবাবু আসিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন প্রায় একটা। আমায় বলিলেন,—তোমার ট্রেন ছটায়, তোমার ত আর দেরী করা চলে না। তুমি জলপাইগুড়ি গিয়ে অবশ্য হাজার জোগাড় করবে,

আর মনে মনে মনে টেলিগ্রাম ক'রে আমায় জানাবে। আমি বলিলাম, আমি জলপাইগুড়ি কাহার কাছে যাইব? তিনি বলিলেন,—বার-লাইব্রেরীতে গেলেই জোগাড় হবে। ডাক্তার প্রমথনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন,—আপনি ঠিক বলেছেন, বার-লাইব্রেরীতে গেলেই জামিন জোগাড় হবে। আমায় দেখাইয়া বলিলেন, একটির ত জোগাড় এখানেই হয়েছে, আর দুটি সেখানেই মিলবে।

তিনিও হাসিতে লাগিলেন।

আমি তখন প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। তিনি মাথায় হাত বুলাইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন—তুমি এসো। টেলিগ্রাম করতে ভুলো না। এই বলিয়া তিনি শিশিরবাবুর সঙ্গে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই তাঁহার আদেশ মত আমি দার্জিলিঙ হইতে চলিয়া আসি এবং তাঁহার উপদেশ মত জলপাইগুড়ি গিয়া জামিনের জোগাড় করিয়া টেলিগ্রাম করি।

তখন কে জানিত এই তাঁহার সহিত শেষ দেখা! তার দশদিন পরেই যখন এই নিদারুণ সংবাদ শুনি তখন প্রথমটা আমরা কেহ বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এখনও মনে হয়, তিনি কোথায় যেন আছেন, তাঁহার সহাস্য মুখখানি আবার দেখিতে পাইব—যখন জাগিয়া থাকি, মনে হয় ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে যদি একবার

দেখিতে পাইতাম। ঘুম ভাঙিয়া যায়, মাঝে মাঝে মনে হয়, দূর—অতিদূর হইতে তাঁহার সেই অমৃত পরশ যেন দেবতার আশীর্বাদের মত অনুভব করি।

শেষ

বিশেষ দ্রষ্টব্য—৬৮ পৃষ্ঠার ৫ম হইতে ৮ম লাইন বাদ দিয়া পড়িতে হইবে।

Techno Hope '99

Reunion, Social & Cultural Programme
20th & 21st Feb '99.